মধুসূদন :
কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ

সৈয়দ আলী আহসান

মধুসূদন :
কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ

মুক্তধারা



প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
মাঘ ১৩৭৮

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আবুল বারক্ আলভী

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

MADHUSUDAN: KABIKRITI O KABYADARSHA: A Critical Analysis of Madhusudan's Poetry in Bengali by Syed Ali Ahasan Published by MUKTADHARA [Swadhin Bangla Sahitya Parishad] 74 Farashgonj, Dacca—1, Bangladesh, Price Taka twelve only.

'মধুসূদন : কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ' প্রকাশিত হল। মধুসূদনের সমগ্র কাব্যসাধনার একটি পরিচয় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। আমি প্রধানতঃ চেষ্টা করেছি মধুসূদনের শিল্প-কৌশলকে বিশ্লেষণ করার। সেদিক থেকে এ-গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মধুসূদন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি থেকে ব্যতিক্রম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় **সৈয়দ আলী আহসান**

সূচীপত্র

মধুসূদন ঃ কবি-জীবনী

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। একই বছরে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ সালে। এ-বছরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমা' কাব্য প্রকাশিত হয়। 'তিলোত্তমা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যে নতুন যুগের সূচনা হল, যেমন গদ্যে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিলো। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের এ নতুন অধ্যায় যখন আরম্ভ হয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন অধ্যায়েরও সূচনা তখনই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কুইনস্ প্রোক্লামেশন' (Queen's Proclamation) বলে খ্যাত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে ভারতের শাসন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সত্যিকার বিপ্লবী কবি। অসাধারণ চাঞ্চল্যে এবং জীবন-সচেতনতায় বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন প্রাণময়তা এবং সজীবতার সঞ্চার করেন। রচনা ভঙ্গীতে এবং বক্তব্যে এবং জীবনবোধের সমন্বয়ে আশ্চর্য শিল্প-কুশলতায় তিনি আমাদের সাহিত্যের গতি পরিবর্তন করেন এবং তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন। তিনি বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবর্তন করেন, বাংলার প্রথম আধুনিক

কমেডী ও ট্রাজেডীর স্রষ্টাও তিনি। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমাদের সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। মধুসূদনের মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যের প্রাণধর্ম নতুন সজীবতায় স্ফূর্তি পায়। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারত থেকে তিনি উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সত্য, কিন্তু কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র-সৃষ্টি, এবং শব্দ প্রয়োগের কৌশল ও চাতুর্য তিনি শিখেছেন হোমার-ভার্জিল দান্তে মিল্টন থেকে। বিদেশী প্রভাব বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ উদ্দীপনা, প্রাণময়তা, দীপ্তি ও চাঞ্চল্য সমস্ত কিছুই মাইকেলের কাব্যে এবং জীবনে আমরা পাই। মাইকেলের কাব্য তাঁর জীবন থেকে পৃথক নয়, কিন্তু বিদেশী প্রভাবে তাঁর কাব্য যেখানে উচ্চকিত হয়েছে প্রাণের প্রাচুর্যে, তাঁর জীবন সেখানে নিঃশেষ হয়েছে উচ্ছৃংখলতায়। বিদেশী জীবন ও সংস্কৃতিকে তিনি আপন জীবনে গ্রহণ করেছিলেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে। শৈশব থেকেই দেশজ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং বিরূপতা ছিলো। এ ঘৃণার প্রকাশ্য পরিচয়স্বরূপ পাই তাঁর হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ এবং খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন, ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ এবং ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াস। ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনার অসার্থকতা-নিবন্ধন বাধ্য হয়ে মাতৃভাষা তাঁকে অবলম্বন করতে হয়। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর।

মধুসূদনের জীবনে শান্তি ও সুখভোগ ছিলো না। উচ্চাশা এবং বিশৃংখল জীবনযাপনই মূলত তাঁর সর্বনাশের জন্য দায়ী। তিনি ছিলেন যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামের এক ধনী আইনজীবীর পুত্র। কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রাম। এ নদী সম্পর্কে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন—"দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!" শৈশবে গৃহে মাতৃভাষা ও ফারসী ভাষার চর্চার পর খিদিরপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৩৭ সালে খিদিরপুর বিদ্যালয়ের পাঠচর্চা শেষ করে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষাকাল ছ বছর। এখানে পাঠকালে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। এ আকর্ষণ শেষে তীব্র উন্মাদনায় পরিণত হয়। ইংরেজীতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ইংল্যাণ্ডে যাবার

জন্য ব্যাকুল হন। সতেরো বছর বয়সে লেখা এক ইংরেজী কবিতায় এ-ব্যাকুলতার পরিচয় আছে—

> "I sigh for Albion's distant shore,
> Its villages green, its mountains high ;
> Tho' friends, relations I have none
> In that fair clime, yet oh' I sigh
> To cross the vast Atlantic wave
> For glory or a nameless grave."

মাইকেলের উচ্চাশার অন্ত ছিলো না। বালক বয়সেই Blackwood's Magazine এবং Bentley's Miscellaney-তে ইংরেজী কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এ-বয়সে বায়রণ ছিলো তাঁর প্রিয় কবি। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাধকদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মালো। তিনি ক্রমান্বয়ে হোমার, ওভিদ, দান্তে, টাসো এবং মিলটনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। বায়রণ নেপথ্যে গেলেন।

খৃষ্টান হবার পর তিনি বিশপ্‌স্ কলেজে ভর্তি হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগতো পূর্বেই ছিলো, এবার তা তীব্রতর হলো। কলেজে অধ্যয়ন কালে ন্যূনাধিক বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন—বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ল্যাটিন, গ্রীক, হীব্রু, ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান।

খৃষ্টান হলেন বলে পিতা তাঁর অর্থসাহায্য বন্ধ করলেন। মধুসূদন তখন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজে যান। স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি একটি স্কুলে ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে সেখানকার বিবিধ ইংরেজী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে কিছু অর্থোপার্জন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু খ্যাতিও লাভ হয়। এ-সময়ে তিনি অনবরত ইংরেজী কবিতা লিখেছেন। টিমোথি পেনপোয়েম (Timothy Penpoem) ছদ্মনামে তাঁর অনেক কবিতা মাদ্রাজ সার্কুলার (Madras Circular), স্পেক্‌টেটর (Spectator) ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুদিন

মাদ্রাজের হিন্দু ক্রোনিকল Hindu Chronicle পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৫২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাদ্রাজে আসবার পরের বছর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের Captive Lady প্রকাশিত হয়। উক্ত কাব্যের সঙ্গে The Visions of the Past নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতাও প্রকাশিত হয়। এ-সময় সম্রাট ইলতুৎমিস-এর দুহিতা রিজিয়াকে নায়িকা করে 'Rizia' নামে একখানি নাট্য কবিতা রচনা করেন। এ সময় তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস নাম্নী এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিবাহ তাঁর পক্ষে সুখের হয়নি। ইংরেজী কাব্য-রচনায় মধুসূদনের খ্যাতি বিশেষ হল না। স্বদেশবাসীর কাছে গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজী সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিতে 'ক্যাপটিভ লেডী' উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ নয়। মধুসূদন এক খণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডী' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বীটনকে উপহার দিয়েছিলেন। বীটন মধুসূদনের প্রতিভার প্রশংসা করেন, কিন্তু উপদেশ দেন যে মধুসূদন যদি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে চান তবে তাঁর কর্তব্য হবে মাতৃভাষার চর্চা করা। গৌরদাস বসাককে লিখিত এক পত্রে তিনি এ উক্তি করেছিলেন: "But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write."

[যোগীন্দ্রনাথ বসু: জীবন চরিত, ৪র্থ সং]

মধুসূদনের পিতার মৃত্যু হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন মধুসূদনকে বাধ্য হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সে-বছরই তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং হেনরিয়েটা নাম্নী জনৈকা ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুখে-দুঃখে সবমুহূর্তে মধুসূদনের সহচরী ছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী

মধুসূদন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র কিশোরীচাঁদ মিত্রের পুলিশ আফিসে। মধুসূদন সেখানে জুডিশিয়াল ক্লার্ক ছিলেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি পুলিশ কোর্টে দোভাষী পদে নিযুক্ত হন।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক ঘটে আকস্মিকভাবে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে একটি শখের নাট্যশালা ছিলো। তাঁরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক যখন অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তখন মধুসূদনকে 'রত্নাবলী'র ইংরেজী তর্জমা করতে বলা হয়। উদ্দেশ্য, অভিনয়ের দিনে আহূত ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা। মধুসূদনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে মধুসূদনের মনে নাটক লিখবার সংকল্প জাগে। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধরীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিতে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করলেন। ১৮৫৮ সালে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হল, এবং পরের বছর বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চেই অভিনীত হল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে থেকেই মধুসূদনের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত। এ সময় বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কার এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পরীক্ষা এবং সম্ভাবনার সূচনা হল। মধুসূদন আরো নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। একটি গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করে 'পদ্মাবতী' রচিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকে গ্রীক দেবদেবীর পরিবর্তে হিন্দু দেবদেবী বসানো হয়েছে, কিন্তু কোথাও মূল কাহিনীর সৌন্দর্য খর্ব হয়নি ; বরঞ্চ নতুন আধারে তা নতুনভাবে দ্যুতিমান হয়েছে। এর পর মধুসূদন দুটি সামাজিক প্রহসন রচনা করেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উচ্ছৃংখল প্রকৃতির যুবকদের বিপথ-গমনের চিত্র এঁকেছেন প্রথমটিতে ; দ্বিতীয়টিতে তথাকথিত আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের প্রতি শ্লেষ আছে। এ নাটক দুটিতে মধুসূদনের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আছে। সংলাপ-রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা এবং সজাগ অনুভূতির পরিচয় মধুসূদন এ নাটক দুটিতে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী' ও 'শর্মিষ্ঠা'র ভাষা শ্লথ ও আড়ষ্ট কিন্তু প্রহসন দুটি সমাজ-নির্ভরতার জন্যই সমসাময়িক কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছে।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদনের দান সম্পর্কে বলা যায় যে,

ক. মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলা নাটককে মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন অর্থাৎ অভিনয় ও মঞ্চ-সজ্জার মধ্যে নাটককে দৃশ্যমান করলেন। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাতে অভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখিত হয়নি, সেজন্য দুঃখ করে 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছিলেন—

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

খ. মধুসূদনই সর্বপ্রথম সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আচ্ছন্নতা থেকে যতটা সম্ভব বাংলা নাটককে মুক্ত করেছিলেন।

গ. তিনিই সর্বপ্রথম নাট্য-কাহিনীতে একটি দৃঢ় সংবদ্ধ রূপ দেন। তাঁর কাহিনীগুলিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি আছে।

ঘ. পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুশীলনে বাংলা নাট্যশিল্পে তিনি বিপুল পরিবর্তন আনলেন।

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকটি রচিত। শর্মিষ্ঠার নির্বাসন থেকে আরম্ভ করে যযাতির জরামুক্তিতে নাটকটি শেষ হয়েছে। হিন্দু পুরাণের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করার মধ্যে মধুসূদনের যে দক্ষতা ও আনন্দ ছিল, শর্মিষ্ঠায় তার পরিচয় নেই। মধুসূদন এখানে মহাভারতের কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। যেহেতু নাটকটি পরীক্ষামূলক এবং জীবন সম্পর্কে কবির কোন জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য এখানে নেই তাই উপাখ্যানভাগে মধুসূদন কোনও পরিবর্তন আনেননি।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকটিতে কয়েকটি নাটকীয় বিচ্যুতি আছে যেমন (১) প্রধান কাহিনীগুলি বিবৃত হয়েছে, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব বা ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট হয়নি। (২) বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে অথচ নাটকের গতিবিধিতে তার পরিচয় নেই। (৩) প্রতিটি চরিত্রই প্রথমাবধি অত্যন্ত স্পষ্ট, কোনও চরিত্রই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়নি। যযাতির জীবনের দুটি বিবাহ উপাখ্যান নাটকটির উপজীব্য। প্রথম

উপাখ্যানে পাচ্ছি—দেবযানীর সঙ্গে প্রণয়, বিবাহ ও সংসার-জীবন; দ্বিতীয় উপাখ্যানে পাচ্ছি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচয়, গোপন প্রণয় ও বিবাহ। এই উভয় কাহিনীর মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত মূলত কোনও সংযোগ নেই, অস্বাভাবিকভাবে চতুর্থ অঙ্কে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র বন্ধন করা হয়েছে।

গ্রীক পুরাণের কলহ দেবী বা Discordia অন্যান্য দেবীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য একটি স্বর্ণনির্মিত আপেল নিক্ষেপ করেন। আপেলটি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেবীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জুপিটরের পত্নী জুনো, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালাস এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনাস সুবর্ণ আপেল পাবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামলেন। বিচারের ভার পড়লো ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের উপর। প্যারিস ভিনাসকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিবেচনা করে তাঁকেই আপেল দিলেন। প্যালাস ও জুনো অভিমান ও ঈর্ষায় প্যারিসের সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনাস, ডিস্‌কর্ডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত। যক্ষরাজমহিষী মুরজা দেবী হচ্ছেন গ্রীক পুরাণের প্যালাস দেবী।

'শর্মিষ্ঠা'র পরে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' ১৮৬০ রচনা করেন। গ্রীক পুরাণের কাহিনী নাটকটির ভিত্তিভূমি।

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি। প্রাচ্য নাট্যরীতি অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্য অলঙ্কারের নির্দেশ অনুসরণে কবি 'কৃষ্ণকুমারী'কে বিয়োগান্তক করেন। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে নির্যাতিত জীবনের ভয়ানক পরিণতি 'কৃষ্ণকুমারী'র উপজীব্য। 'কৃষ্ণকুমারী'র পূর্বে যে দুটি বিয়োগান্ত নাটকের সন্ধান আমরা পাই, 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২), এবং 'বিধবা বিবাহ নাটক' ১৮৫৬ সেগুলো শুধুমাত্র মৃত্যু পরিণতির কারণেই শোকাবহ। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিচয় তাতে নেই। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে নর-নারীর হৃদয় বেদনা আবেগে এবং সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদন এ নাটকে নাটকীয় সংলাপের প্রকৃতি

আবিষ্কার করেছিলেন। তিনিই প্রথম ইঙ্গিত করেন যে নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ কাব্যভাবে ভারাক্রান্ত না থেকে চরিত্রকে সুস্পষ্ট করবে এবং কাহিনীর গতিধারা নির্মাণ করবে—"I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry."

'মায়াকানন' (১৮৭৪) অত্যন্ত দুর্বল নাটক। মধুসূদনের জীবন যখন নিঃশেষিত-প্রায় সে সময় ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি এ নাটকটি রচনা করেন। প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর।

প্রহসন রচনায় মধুসূদনের অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। কথ্য রচনাভঙ্গীর নিশ্চিত স্বাভাবিক গতি, বিভিন্ন চরিত্রের নির্বাধ প্রকাশ এবং সমাজের বিকারের কৌতুকাবহ উন্মোচন প্রহসন দুটিকে উজ্জ্বল করেছে।

এর পর মধুসূদন আপন ক্ষমতা সম্পর্কে সজ্ঞান হলেন। তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিণতিরূপে আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা'কে পাচ্ছি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমা'র অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের বছর ইংরেজী ১৮৫৯ সাল। একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করে কাব্যটি লেখা। গল্পটি এই—সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুর ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা পরাভূত হয়েছেন। স্বর্গচ্যুত দেবতারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অসুরদের সঙ্গে জয়ী হতে পারবেন না জেনে ব্রহ্মার সহায়তায় অপরূপ লাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে বিন্ধ্য-কাননে রেখে আসেন। সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়েই তিলোত্তমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে। দেবতারা আবার স্বর্গ অধিকার করেন। গল্পটি পৌরাণিক বটে কিন্তু ঘটনা-সংস্থানের কৌশল এবং চরিত্র পরিকল্পনা ইউরোপীয়। কীটস্-এর Hyperion এর অনুসরণে মধুসূদন পরাজিত দেবতাদের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু Hyperion-এর প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় 'তিলোত্তমা'য় নেই। ইংরেজী কাব্যে নিবিড় অন্ধকারে পরাজিত দেব চিত্র অন্ধকারের মতই ভয়াবহ, নিশ্চিন্ত এবং আয়ত্তের অতীত।

'তিলোত্তমা'র লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারের পরীক্ষা। মাইকেল জানতেন যে এ গ্রন্থে মানবীয় বোধের পরিচর্যা ঘটেনি। কিন্তু তবুও নতুন ছন্দ এবং শব্দ-ব্যবহারের কৌশলের দিক থেকে বিচার করে এ কথা বলা চলে যে, 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এতদিন বাংলা কাব্যে ছিলো পয়ার ও ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণ। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে মধুসূদন পুরোনো পয়ারকে অবলম্বন করেই তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত করলেন। চারি সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজী Blank Verse এর মূল হচ্ছে পঞ্চপাবিক আয়ামবিক (iambic)। ইংরেজী ছন্দ সিলেবিক (Syllabic) বা স্বরমাত্রিক হওয়ায়, পর্ববিভাগের সময় দুই বা ততোধিক সিলেবলের কোনো শব্দের এক বা দুই সিলেবল এক পর্বে এবং অবশিষ্টাংশ অন্য পর্বে পড়ে। এ কারণে কবিতা পাঠকালে কণ্ঠযতি সর্বত্র ছন্দ-যতিকে অনুসরণ করে না। এ সুবিধা থাকায় আয়ামবিক ছন্দ ব্লাঙ্ক ভার্সের গদ্যভঙ্গীতে সহজে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। বাংলা পয়ারে স্পষ্টত এ সুবিধাটা ছিলো না। মধুসূদনের পূর্বেকার সকল কবিরাই ছন্দ যতি এবং কণ্ঠ-বিরতি একই স্থানে রেখেছেন। উপরন্তু পয়ার বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। মধুসূদনের ক্ষমতা অসাধারণ এ কারণে যে, তিনি পয়ারের মতো ঢিমে তালের গতানুগতিক ছন্দের মধ্যেও আশ্চর্য সম্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। অমিত্রাক্ষর, চরণান্তের মিলকেই কেবল রহিত করলো না, উপরন্তু যতি-বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে ছন্দকে অর্থের এবং কণ্ঠধ্বনির অনুগামী করলো। ইংরেজী কাব্যে 'ব্লাঙ্ক ভার্স' উদ্ভাবনার যে কৃতিত্ব মার্লো'র, বাংলা কাব্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব তারও অধিক। মার্লো 'ব্লাঙ্ক ভার্সে'র পূর্ণ রূপ দিতে পারেননি, মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে অমিত্রাক্ষরের পূর্ণতা দিয়েছেন। মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকেই প্রথম গদ্যের মধ্যে কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর-ছন্দের প্রবর্তন করেন। সেখানে চরণান্তের মিলটাই শুধু রহিত হয়েছে, অন্য কোনো পরিবর্তন আসেনি।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি 'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্য। গ্রীক কাব্যের সৌন্দর্য এবং অসাধারণ দীপ্তিকে মধুসূদন সম্পদ করলেন বাংলা ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ উপাখ্যানগত, কিন্তু গ্রীক সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ স্টাইল বা রচনাশৈলীগত। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশসম্মত মহাকাব্য মধুসূদন লেখেননি, তিনি মহাকাব্যের প্রাণধর্মকে পেতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের অস্থি সংস্থানের নির্দেশ আছে, যেমন সর্গ কয়টি হবে, নায়ক কোন বংশের হবেন, বিষয়বস্তু কি হবে, বর্ণনা থাকবে কিসের ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীক অলংকার-শাস্ত্রে মহাকাব্যের প্রাণধর্মের ইঙ্গিত আছে, যেমন ছন্দ ও ভাষা হবে বিষয়বস্তুর অনুগামী এবং সে বিষয়বস্তু হবে বিপুল, ব্যাপক, গভীর এবং উদাত্ত। মহাকাব্যে কবি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে মানব-ভাগ্যের চিত্র অঙ্কন করবেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' আমরা মানব জীবনের বিশিষ্ট কোনা একটি দিকের পরিচর্যা পাই না, কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কর্মচঞ্চল অবস্থায় দেখি। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, কবির জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা। গেটে ফাউস্ট সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ফাউস্ট নাটকে তাঁর বেদনার বাণী অপরিচিত ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা এনেছে এবং এ প্রশংসা তাঁকে ভীতি-বিহ্বল করেছে। তাঁর স্নায়ুতেও কম্পন জেগেছে এবং তিনি ক্রন্দন করেছেন। নতুন প্রাণোন্মদনায় মাইকেলের স্নায়ুতেও কম্পন জেগেছিলো। জীবনের জটিলতা তাঁকে জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার সুযোগ দিয়েছে। বিতৃষ্ণা, বেদনা, অশেষ আশা, লাঞ্ছনা, নিষ্ফলতা, সংশয় এবং দ্বন্দ্ব এ কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে মহৎ কাব্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। প্রথম সর্গে সমুদ্রকে লক্ষ্য করে বীরকুলর্ষভ রাবণ অভিমান এবং আক্ষেপ প্রকাশের মধ্যে জীবনের ক্ষণকালীন বৈকল্যের পরিচয় যেমন দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি এবং অপবাদদূরীকরণার্থে আত্মপ্রতিষ্ঠার

আবেদনের মধ্যে জীবনের পূর্ণতার পরিচয়ও দিচ্ছে। যে সমস্ত উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এ-পূর্ণতার পরিচয় পাচ্ছি, তাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, গতি এবং বলিষ্ঠতা মূর্ত হয়েছে। প্রথম সর্গের অন্যত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে রাবণের খেদোক্তি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। শক্তিধর নায়ক আপন সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করছে কিন্তু সর্বনাশকে রোধ করবার সামর্থ্য তার নেই। সম্ভাব্য প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও সে অকম্পিত পদে মৃত্তিকার ওপর দণ্ডায়মান থাক্‌তে চায়। এ ভাবেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আমরা জীবনের প্রকাশ দেখি দ্বন্দ্বের মধ্যে, সর্বনাশের মধ্যে এবং কোলাহল ও আবর্তকে অবলম্বন করে সর্বশেষ বিলয়ের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উৎকণ্ঠা এবং অপ্রমেয় আশা রাম রাবণের সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে। একথা বলা চলে যে, মধুসূদন সে-যুগে জাতির পূর্ণ-সচেতন মুহূর্তে বর্তমান ছিলেন। যে-মুহূর্তে জাতির মানস-বিকাশ ঘটে, সে মুহূর্তকে তিনি রূপ দিয়েছেন। মানব অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি যে-কোনো যুগে অতি অল্পসংখ্যক লোকের কাছেই ধরা পড়ে; মধুসূদন সে-অল্পসংখ্যকদেরই একজন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' হোমারের 'ওদিসি' এবং 'ইলিয়াদ', ভার্জিলের 'ইনিদ', দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রভাব আছে। এ-প্রভাবটি তিন প্রকারের। প্রথমত ঘটনা বা কাহিনীগত; দ্বিতীয়ত ভাষা বা শব্দব্যবহারগত এবং তৃতীয়ত আদর্শগত।

ঘটনার দিক থেকে যে কয়টি প্রধান মিল বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পাচ্ছি তা হচ্ছে এই, দ্বিতীয় সর্গে যেখানে 'রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী' অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় রামের জয় এবং রাবণের পরাজয় কামনা করছেন, সে অংশের সঙ্গে 'ওদিসির' প্রথম পুস্তকের মিল আছে যেখানে দেবী এথেনে টেলিমেকাসের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পঞ্চম সর্গে মায়া দেবী স্বপন-দেবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঘুমন্ত লক্ষ্মণের কাছে যেতে। ইলিয়াদের দ্বিতীয় পুস্তকে জিউস স্বপ্নকে নির্দেশ দিচ্ছেন আগামেমননের কাছে যেতে। অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেকটা স্থূলভাবে রূপ পেয়েছে। এখানে একই সঙ্গে দান্তে, হোমার এবং ভার্জিলের অনুকরণ

দেখি। মধুসূদন নিজে অবশ্য শুধু ভার্জিলের 'ইনিদের' কথাই লিখেছেন, কিন্তু আমরা 'ওদিসি'র একাদশ পুস্তকের প্রভাবটাই বেশী দেখি। রাম নরকে যাচ্ছেন তাঁর পিতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেমন ইনিস পাতালে গিয়েছিলেন তাঁর পিতা এ্যান্‌কিশিসের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অথবা ওদিসি তাঁর মাতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন চিরনিশাবৃত মৃত্যুর দেশে। 'মেঘনাদবধে'র আরম্ভের দেব-বন্দনা 'ইনিদের' দেব-বন্দনার মতো।

ভাষা বা শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে এ-কথা বলা যায় যে, মধুসূদন বিদেশী ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীকে আয়ত্ত করে বাংলা কাব্যকে তার গতানুগতিক বিমর্ষ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করেন। বিশেষণ এবং উপমা প্রয়োগের মধ্যেই মধুসূদনের এ-প্রগাঢ় উপলব্ধির পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর কল্পনা এবং বোধের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী, সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব নন্দিনী আমি রক্ষ কুল-বধূ।"

অথবা— "যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিক; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধুম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জে।"

অথবা— "অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্দে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।"

প্রথম উদ্ধৃতিতে প্রমীলা আপন লক্ষ্য এবং সে-লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সর্বপ্রকার বাধাকে উন্মূল করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিচ্ছে। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে রামচন্দ্রের আক্রমণকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে বৃষস্কন্ধে

ব্যাঘ্রের আক্রমণের সঙ্গে তার তুলনা করে। উপমানের অর্থ ব্যক্তির জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় না, কবি সর্বপ্রকারে উপমানকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রকৃতির নাটকীয় গতিময় উপমা সর্বপ্রথম হোমার ব্যবহার করেছিলেন বলে একে 'হোমারিক সিমিলি' (Homeric similie বলা হয়। উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন যে হোমারকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন তার প্রমাণ পাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রচুর পরিমাণে সিংহ বা ব্যাঘ্রের এবং অগ্নির উপমা প্রয়োগের মধ্যে। 'ইলিয়াদ' এবং 'ওডিসির' প্রধান প্রধান উপমাই হচ্ছে সিংহ এবং অগ্নির। মধুসূদনও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সিংহের উপমা এবং অগ্নির উপমা বহুবার ব্যবহার করেছেন—সিংহ বা ব্যাঘ্রের ছাব্বিশ বার এবং অগ্নির পনেরো বার। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক উপমায় অবশ্য মধুসূদন বাঙালী জীবন এবং পরিবেশের নিগূঢ় পরিচয় দিয়েছেন, যেমন—

"হায়রে যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুল রবি শূর রাঘবের শরে।"

অথবা— "বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যাজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে।" ইত্যাদি।

সব শেষে জীবনাদর্শের কথা। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় একটি বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ মূর্ত হয়েছে। এখানে মিলটনের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। 'প্যারাডাইস লস্টে'র শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনার প্রতীক, রাবণও তেমনি অশেষ আশা এবং অফুরন্ত শক্তির প্রতীক। রাবণ সমস্ত সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হয়েছে। ভাগ্যের বিরূপতা সে জানে কিন্তু যেহেতু সম্ভাব্য পরিণতি রোধ করা তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাই সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকতে চায়। অনেকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' গীতিময়তার লক্ষণ পেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ চতুর্থ সর্গের অশোকবনে সীতার কাহিনীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কোমলতা কখনও দুর্ধর্ষতার বিরোধী নয় বরঞ্চ অনুসংগীই। বিপুল পরিসরের একটি কাব্যে গীতিলালিত্যের প্রয়োজন আছে মহাকাব্যের

ভয়াবহ বোধের রিলিফ (relief) বা উপশমের জন্য। তাছাড়া কাহিনীর দ্রুতগতির মধ্যে কখনও কখনও বিরাম না থাক্‌লে চলে না। চতুর্থ সর্গ কাহিনীর জন্য এভাবেই একটি রিলিফ এবং প্রয়োজনীয় বিরাম সৃষ্টি করেছে।

মধুসূদনের কাব্য-সাধনার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সময় হচ্ছে ১৮৬১-৬২ সাল। এ-দুই বছরের মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক খণ্ডকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এটা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর আধুনিক পরিণতি। মধুসূদন এগুলোকে 'ওড' (ode) আখ্যা দিয়েছেন। এখানে কবি রাধা বিরহের গান গেয়েছেন। তত্ত্ব বা রূপক সম্বলিত বৈষ্ণবভাব এখানে নেই, সহজ লিরিকের ভাবটাই এখানে প্রধান। যেমন—

"সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর দুয়ারে মোর নাগর
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধার আমি ? ধিক্ এ যুকতি !"

এ সময়ে তিনি 'সুভদ্রা উপাখ্যান' নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি নাটক রচনা করেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী হবে না বিবেচিত হওয়ায় তা আর প্রকাশিত হয়নি। একই কারণে, Rizia নাট্য-কবিতার বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেও তিনি তা প্রকাশ করেননি।

'বীরাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ইতালীয় কবি ওভিদের (Publius Ovidius Naso—43 B.C.—17 A.D.) Heroides কাব্যের অনুকরণে 'বীরাঙ্গনা' রচিত। ওভিদ প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য এবং পুরাণের বিভিন্ন নায়িকার চিত্ত উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন পত্রাকারে। 'হিরোয়দস'-এর পত্র-সংখ্যা একুশ। এর মধ্যে প্রথম পনেরোটি ওভিদের। অন্য ছয়টি ওভিদের কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রথম পনেরোটিই

কেবলমাত্র নায়িকা-পত্র, কিন্তু পরের ছয়টি নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রত্যুত্তর। মধুসূদনও একুশটি পত্রই লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র এগারটি পত্র সম্পূর্ণ লিখেছেন, অতিরিক্ত পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকাও আছে। 'হিরোয়দস' এ প্রাচীন কাব্য-খ্যাত বিভিন্ন পরিত্যক্তা রমণীর কল্পিত পত্র পাই, যেমন ইনিসের কাছে লিখিত দিদোর পত্র, প্যারিসের কাছে লিখিত ইনোনীর পত্র, ইউলিসিসের কাছে লিখিত পেনিলোপীর পত্র ইত্যাদি। শুধুমাত্র আবেগের দিক থেকেই নয়, পরিবেশ এবং ঘটনার দিক থেকেও 'বীরাঙ্গনার' সঙ্গে 'হিরোয়দস' এর সাদৃশ্য আছে। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'কে 'ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপী' পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়, 'সোমের প্রতি তারা'র সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'হিপোলিটাসের প্রতি ফেইড্রা' পত্রের; 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' পত্রের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'দেমোফোনের প্রতি ফিলিস' পত্রের।

'বীরাঙ্গনা'য় আমরা অমিত্রাক্ষরের পূর্ণ পরিণতি দেখি। ভাষার গাম্ভীর্যে, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যে 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদবধে'র চাইতেও পরিণত সৃষ্টি। পরিপূর্ণ হৃদয়-সংযোগে শব্দ যে অসাধারণ অর্থে শিহরিত হয়ে ওঠে তার পরিচয় আছে 'বীরাঙ্গনা'র 'সোমের প্রতি তারা' পত্রে—

"যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে!
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজী
বন-রত্ন' রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু, কাঁদি, বন দেবী-পদে

দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায়রে অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজি !—
তারার যৌবন বন-ঋতুরাজ তুমি !"

পিতার মৃত্যুর পর মধুসূদন যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হন। সে অর্থব্যয়ে দেশে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন এবং মাতৃভাষার চর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিলো, কিন্তু জীবন ক্ষেত্রে অধিকতর উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুন তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারী শিক্ষার জন্য মধুসূদন গ্রেজ ইন এ প্রবেশ করেন। দেশে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন কিন্তু পত্তনিদারগণ কিছুদিন পর মধুসূদন এবং তাঁর স্ত্রীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করে হেনরিয়েটাও পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পরিবারবর্গ সহ মধুসূদন লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে এবং পরে ভার্সেই-এ অবস্থান করতে থাকেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগরের নিকট পত্র লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের অর্থানুকূল্যে মধুসূদন চরম দুর্দশা থেকে মুক্তি পান। ভার্সেই এ প্রবাসকালে তিনি আত্মিক ক্লেশ পেয়েছিলেন, অনেক সময় সপরিবারে দেনার দায়ে জেলে যাবার আশঙ্কা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এমন দুর্দিনেও সাহিত্য-চর্চায় তাঁর অসাধারণ আগ্রহ দেখে অবাক হতে হয়। সে সময়ে লিখিত তাঁর একটি পত্রে আছে—

"Though I have been very unhyppy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe."

মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করবার নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে নানা দেশের নানা রত্ন তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে গৌরদাস বসাককে লেখা একটি পত্রে কবির সঙ্কল্পের ইতিহাস পাওয়া যায় ঃ

"I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz. Italian, German and French languages—which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our tongue···I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother tongue and his native land may animate all men of talent among us."

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সেই এ (Versailles) অবস্থানকালে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনায় মনোনিবেশ করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং কলকাতায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে এগুলো প্রকাশিত হয়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক-এর অনুকরণে চৌদ্দপংক্তির পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করা মধুসূদনের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া এ-গ্রন্থেই মধুসূদনের অপূর্ব মাতৃভূমিপ্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। বিদেশে থাকাকালীন নির্বান্ধব পরিবেশে মাতৃভূমির কথা তাঁর মনে জেগেছে এবং তিনি দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, শ্যামা-পক্ষী, শিব-মন্দির এ-সবের প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এ-আকর্ষণ যে কত আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অনাবিল তার পরিচয় আমরা পাই 'বঙ্গভাষা' কবিতায়—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে (অবোধ আমি ! অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে ॥"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কল্‌কাতায় ফিরে এসে মধুসূদন ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন কিন্তু আইন-ব্যবসায়ে তিনি চরমভাবে ব্যর্থকাম হন। অর্থাগম যে হয়নি তা নয় কিন্তু সমস্ত অর্থ ব্যয় হত পান-ভোজনে এবং অন্যবিধ অপব্যয়ে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পুত্রকন্যাসহ তাঁর পত্নী দেশে ফিরে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যারিস্টারিতে মধুসূদনের বিশেষ উন্নতি হল না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি বাধ্য হয়ে ব্যারিস্টারি ছেড়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পদত্যাগ করে আবার ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হোমারের ইলিয়াদ-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে 'হেকটর বধ' প্রকাশ করেন। অসুস্থ অবস্থায় 'হেকটর বধ' রচনা করেছিলেন, তা ছাড়া সাহিত্য সাধনার তাগিদেও গ্রন্থটি রচিত নয়। তাই মধুসূদনের প্রতিভার বিশিষ্ট কোনও স্বাক্ষর এ-গ্রন্থে নেই। এ-সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা একটি মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে ঢাকায় আগমন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন।

ঢাকাবাসীরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলো। একটি সনেটে তিনি সংবর্ধনার উত্তর দিয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন কিন্তু বেশীদিন সেখানে ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন রোগাক্রান্ত কবি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। এর দুদিন পূর্বেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটেছিলো।

দেশে ফিরে এসে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় মধুসূদন আর কিছু রচনা করেননি। অভাবের তাড়নায় 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামালা এবং পূর্বে উল্লেখিত 'হেকটর বধ' নামে একটি গদ্যকাব্য লিখবার চেষ্টা করেছিলেন। কোনটাই শেষ হয়নি।

মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একসময় লিখেছিলেন যে তাঁর আবির্ভাব হবে ধূমকেতুর মতো। সত্যিই ধূমকেতুর মত অপরিচয়, আকস্মিকতা এবং অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য নিয়েই আমাদের সাহিত্যাকাশে তিনি অতি সংক্ষেপ-কালের জন্য সঞ্চরণ করেছিলেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

১

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) একটি পরীক্ষামূলক কাব্য—পরীক্ষা ভাষার দিক থেকে অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের নবলব্ধ রীতি-প্রকরণের দিক থেকে। যদিও এক সময় বাংলা ভাষার নতুন কাব্য-ধারার সূত্রপাত হিসেবে এ কাব্যটিকে বিবেচনা করা হয়েছিল,[১] কিন্তু বর্তমানে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কেই উনিশ শতকের জীবনচেতনার স্মারক গ্রন্থ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি। ভাবের দিক থেকে অর্থাৎ বিষয়বিন্যাসে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' তার প্রকাশকালে একটি নতুন মাধুর্য পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে এখন আর তা বিবেচিত হচ্ছে না। মোহিতলাল মজুমদারের কথায় এ কাব্যে কবি কল্পনার একটি মুক্তি-সুখ আস্বাদন করতে ব্যাকুল ছিলেন।[২]

আমি বর্তমান প্রবন্ধে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি প্রকরণের পরীক্ষার দিক থেকে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র উল্লেখযোগ্যতা বিচার করবো।

মধুসূদন বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে এর পরিচয় আছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনাকালে বাংলা পয়ারের স্বভাব এবং সেই স্বভাবের বাধ্যতায় কবিতার মধ্যে যে একটি অলস ক্লান্ত ভঙ্গী উপস্থিত হয়েছিল, মধুসূদন তার জন্য অসম্ভব রকম চিন্তিত ছিলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' বাংলা পয়ারের গতানু-গতিক ভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদের সাহস তাঁর এসেছিল ইংরেজীর পঞ্চ-পাবিক আয়াম্বিক-এর (iambic) সঙ্গে পয়ারের

সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। মধুসূদনের বিবেচনায় যদি পঞ্চ-পার্বিক আয়ামবিক ব্লাঙ্ক ভার্সে পরিণত হয়ে ইংরেজী কবিতার প্রকাশ-ক্ষমতাকে অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে বাংলা পয়ার অমিত্রাক্ষরে পরিণত হয়ে বাংলা কবিতাকে সম্মুখগামী করতে পারবে না কেন? তিনি ইংরেজী ব্লাঙ্ক ভার্সে'র উন্মেষকালের কাহিনীর উল্লেখ করে কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রে ইংল্যাণ্ডের কবি Sackville এবং Norton-এর Gorboduc নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ আছে।[৩]

ইংল্যাণ্ডে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Henry Howard, Earl of Surrey সর্বপ্রথম পঞ্চপার্বিক আয়ামবিকের চরণান্তের মিল রহিত করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। Surrey-এর কবিতায় চরণান্তে একটি সুস্পষ্ট বিরতি আছে—যার ফলে প্রতিটি চরণকে ভাবানুষঙ্গে এবং ছন্দ-স্পন্দে একটি ইউনিট বা একক রূপে গণনা করা যাচ্ছে।[৪] উদাহরণস্বরূপ ইনিদের অনুবাদ উপস্থিত করা যায়—

"Who can expresse the slaughter of that night ?
Or tell the nomber of the corpses slaine ?
Or can teres bewaile them worthely ?
The auncient famous citie falleth down,
That many yeres did hold such seignorie,
With senslesse bodies every strete is spred
Eche palace and sacred porch of the Gods."[৫]

উপরের উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র আয়ামবিক ছন্দের couplet বা চরণ-দ্বৈতের চরণান্তের মিল বা যমক-সৌষ্ঠব পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রতি চরণগত বিরতি-বন্ধন তিরোহিত হয়নি। এর ফলে বক্তব্য, অর্থদ্যোতনার অভিঘাতে সম্প্রসারিত হতে পারেনি এবং ছন্দ-স্পন্দ চরণান্তেই নিঃশেষ হয়েছে।

মধুসূদন যথার্থ অনুভব করেছিলেন, Gorboduc নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা সর্বপ্রথম চিহ্নিত হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

"Ah noble prince, how oft have I beholde
Thee mounted on thy fierce and traumpling stede,
Shining in arm our bright before the tilt,
And with thy mistresse sleue tied on thy helme,
And charge thy staffe to please thy ladies eye,
That bowed the head peece of thy frendly foe ?
How oft in armes on horse to bent the mace ?"[৬]

এ-উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরতিগুলো সম্পূর্ণরূপে চরণান্তিক নয়। এখানে ভাবানুসরণ ও শ্রুতিগ্রাহ্যতায় বিরতিবিন্যাসের আংশিক সূচনা ঘটেছে। অধিকন্তু চরণের অভ্যন্তরেও বিরতি বৈচিত্র্যের পরীক্ষা করা হয়েছে।

কবি মধুসূদন সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের উন্মোচনে, চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের উন্মোচনে এবং চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের উন্মোচনে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। 'পদ্মাবতী'তে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে এক পত্রে লিখেছিলেন, আমি ক্রমশ আমাদের নাট্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন দেখতে চাই। আমার মনে হয় প্রথমে অনেক বিবেচনা এবং কৌশলে এ ছন্দকে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে আবেগ উচ্চস্তরের অথবা কাব্যভাবসম্পন্ন সেখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারটা এমন সহজ এবং প্রবহমান হবে যাতে শ্রোতারা অনুভব না করতে পারেন যে তাঁরা ছন্দোবদ্ধ কোনও মনোহর বাক্য শুনছেন। তাঁরা যেন অনুভব করেন যে গদ্যের গতিধারাতেই কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছে।[৭]

'পদ্মাবতী' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সার্থক হতে পারেনি তার কারণ পয়ারের মৌলিক ছন্দ স্পন্দকে রক্ষা করে তিনি বাক্যরীতিকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। বিরতিগুলো অনেকটা অস্বাভাবিকভাবে নির্মিত হয়েছে এবং রচনা প্রায় গদ্যের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি উদ্ধৃতি দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে—

"শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা দুখানি গড়ি তার আমি ! পরিক্রমণ)
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।"[৮]

মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে 'পদ্মাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।[৯]

এদিক থেকে বিবেচনা করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি প্রকরণের পরীক্ষাসূত্রে 'পদ্মাবতী' নাটককে আমাদের বিবেচনার বাইরে রাখতে হবে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'ই সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক পরীক্ষা ঘটলো।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনার ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্লাঙ্ক ভার্সের যতি-বৈচিত্র্যের কথা মধুসূদন চিন্তা করেছিলেন। মূলত যতি-বৈচিত্র্যের কারণেই ভাবের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের একটি অভিনব স্পন্দন যে নির্মিত হচ্ছে সে কথা মধুসূদন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন।[১০]

ইংরেজী caesura-র প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলাতে আমরা যতি ব্যবহার করে থাকি। যতির প্রথম ব্যবহার হোমারের মহাকাব্যগুলোতে পাওয়া যায়।[১১] চরণের অভ্যন্তরস্থ যতি যথার্থ কোনও নিশ্চল বিরতি নয়। মূল বিরতি চরণান্তে সর্বদাই ছিলো, কেননা যেমন গ্রীক ছন্দে (hexametre-এ) তেমনি ইংরেজী আয়ামবিক ছন্দে প্রতিটি চরণ ছিলো একটি পূর্ণ ছন্দ স্পন্দের একক বা ইউনিট। কিন্তু ছন্দস্পন্দের গতানুগতিকতা এবং ক্লান্তি দূর করবার জন্য চরণের অভ্যন্তরে একটি উচ্চারণজনিত শ্বাস বিরতি নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো। এভাবে চরণের অভ্যন্তরস্থ শ্বাস-বিরতিতে প্রতিহত হয়ে সম-মাত্রার পর্বগত স্পন্দন রহিত হয়েছিলো।[১২]

বাংলা পয়ারে মধুসূদনের সময় পর্যন্ত শ্রুতিমাধুর্য সাধন করা হয়েছে যতি স্থাপন করে এবং চরণের শেষে বা যতির শেষে অক্ষরের মিত্রতা বা মিল করে। এর ফলে বাংলা পয়ার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত মিত্রাক্ষর ছিল এবং নিয়মিত যতি বা বিরামবিশিষ্ট ছিল। মধুসূদন যে পরিবর্তন সাধন করলেন তা হচ্ছে, প্রথমত চরণান্তিক মিত্রতা দূর করে এবং দ্বিতীয়ত যতিকে ইংরেজী Blank verse এর caesura-র মতো বিশিষ্টার্থক করে। যেহেতু যতি একটি ধ্বনিতরঙ্গের পরিসরের সীমানার মধ্যে উচ্চারণগত একটি বিরাম, সুতরাং মধুসূদন অনুভব করলেন যে পয়ারের যতিকে তার প্রতি চরণগত আটমাত্রা অতিক্রান্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে দিতে হবে। তিনি দেখলেন যে পয়ারের ছন্দস্পন্দ তাৎপর্যময় হয়, যদি যতিতে বৈচিত্র্য আনা যায়। এ বৈচিত্র্য আনার কৌশল তিনি শিখেছিলেন ইংরেজী Blank verse থেকে। মধুসূদন Gorboduc নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ একটি পত্রে করেছিলেন একথা প্রথমেই বলেছি। Gorboduc নাটকে প্রথম লক্ষ্য করা গেল যে ভাবানুসরণ ও শ্রুতিগ্রাহ্যতায় বিরতি নির্মাণ করা যায়। উক্ত নাটকে সর্বপ্রথম এক চরণ থেকে অন্য চরণে, অর্থসম্পূর্ণতার প্রয়োজনে ছন্দ ও বক্তব্যকে প্রবহমান করা হল। নাট্যকারদ্বয় (Sackville এবং Norton) এই প্রবহমানতা আনবার চেষ্টা করলেন ব্যাকরণগত পদবিন্যাসের কৌশলে, যেমন ক্রিয়াকে এমনভাবে একটি চরণে স্থাপন করলেন যাতে পরবর্তী চরণের বিশেষ্য পদটি উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। এভাবেই Gorboduc নাটকে ব্যাকরণগত প্রবহমানতা এসেছিল। Gorboduc নাটক থেকে যে উদ্ধৃতি আমি পূর্বে উপস্থিত করেছি সেখানে প্রথম চরণের শেষে 'behelde' ক্রিয়াপদটি আছে, দ্বিতীয় চরণের প্রথম শব্দ 'thee' উচ্চারণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বনিতে বিরতি আসছে না। এর ফলে প্রথম চরণ থেকে দ্বিতীয় চরণে একটি প্রবহমানতা তৈরী হয়েছে।

বাংলা পয়ারকে মধুসূদন যে অবস্থায় পেয়েছিলেন সে অবস্থার সঙ্গে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র ছন্দশৈলীর তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। মধুসূদন বাংলা পয়ারকে তার নিরানন্দময় প্রতি চরণাবদ্ধ শিথিল ধ্বনি ব্যঞ্জনা

থেকে মুক্ত করে একটি প্রবহমান বলিষ্ঠ গতিময়তা দান করলেন। পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করবার জন্য আমি এখানে কৃত্তিবাস এবং কাশীরামের রচনা থেকে কয়েকটি চরণ উপস্থিত করছি —

১. যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্রমন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার করে তবে জানি রাম ॥
যোগযাগ তন্ত্রমন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম! তরে নিজগুণে ॥

—কৃত্তিবাস।

২. দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥

—কাশীরাম।

উপরের উদাহরণ দুটিতে বিরতি-বিন্যাসের একটি চরণগত সুষম ও নির্ধারিত স্থিতি আছে, যার ফলে ছন্দে বৈচিত্র্য তৈরী হয়নি এবং একটি ক্লান্তিকর পদক্ষেপ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই ক্লান্তিকর পদক্ষেপের মধ্যেও প্রতি চরণে প্রথম ৮ মাত্রার পর শ্বাসগত যে বিরাম অনুভব করা যায়, মধুসূদন তাকেই স্বাভাবিক ভাব বিকাশের পূর্ণ একক যে বাক্য তার অংশ হিসেবে ব্যবহার করলেন। প্রাচীন পয়ারে চরণ ছিলো একই সঙ্গে ধ্বনি এবং ভাব সম্পূর্ণতার একক। 'যার সঙ্গে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে'—এ-চরণটি যেমন ৮+৬ মাত্রাবিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন করছে, তেমনি তা একটি পূর্ণ বক্তব্যেরও আশ্রয়। যেখানে একটি চরণে বক্তব্য পুরোপুরি শেষ হতে পারেনি, সেখানে চরণদ্বৈতে (couplet) অবশ্যই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে। মধুসূদন গদ্যের মতো কবিতাতেও

বাক্যকে ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করলেন। গদ্যের মতো কবিতাতেও বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে পরিসরগত কোনও সমতা রাখলেন না। ভাব-সম্পূর্ণতার দিক থেকে বিচার করলে যেখানে প্রচলিত পয়ারের সম-পরিমাণের চরণগুলির প্রতিটিই এক একটি বাক্যের মর্যাদা পাচ্ছে অথচ সম পরিমাণের বলেই যেগুলো তাৎপর্যহীন ও শ্লথ গতি, সেখানে মধুসূদন বিভিন্ন পরিসরের বাক্যকে যতি-বিন্যাসের কৌশলের দ্বারা চরণ অতিক্রান্ত করে বিস্তার ও প্রবহমানতার সূত্রে তাৎপর্যপূর্ণ করলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' মধুসূদন বাংলা পয়ারের গতানুগতিক রীতির পরিবর্তন করে যতি বিন্যাসের যে বিশিষ্টতা আনলেন তা স্পষ্ট করবার জন্য আমি এখানে কাব্যের প্রথম ছয়টি চরণকে সমিল পয়ারে গ্রথিত করছি—

"ধবল নামেতে গিরি শিরে হিমাদ্রির।
অভ্রভেদী দেব-আত্মা, ভীষণ মূর্তির॥
সতত ধবলাকৃতি বিপুলা অচল।
উর্দ্ধবাহু শুভ্রকেশী অনড় অটল॥
তপে মগ্ন যেন যোগী শূলী ব্যোমকেশ।
যোগীকুলধ্যেয় তপ সাধিছে অশেষ॥"

এখন উপরের উদাহরণের একটি রূপান্তর উপস্থিত করছি যেখানে শুধুমাত্র অন্ত্যযমক পরিত্যক্ত হয়েছে—

"হিমাদ্রির শিরে গিরি ধবল নামেতে
ভীষণ দর্শন সদা তুঙ্গ অভ্রভেদী;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
উর্দ্ধবাহু সদা যেন, শুভ্রবেশধারী!
তপে মগ্ন যেন যোগী ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুল অলঙ্কার যোগীকুলধ্যেয়।"

এখন মধুসূদনের রচনা উদ্ধৃত করছি—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে

অভ্রভেদী, দেবআত্মা, ভীষণ দর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী ।
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ।"

নিম্নের উদাহরণটি মধুসূদন কর্তৃক 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পুনর্লিখিত অংশ থেকে—

"ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি ; অভ্রভেদী গিরি,
অটল, ধবলকায়, ব্যোমকেশ যেন
উর্দ্ধবাহু শুভ্রবেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী !"

উপরের উদাহরণগুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে প্রথম উদাহরণে প্রচলিত পয়ারের রীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে অথবা বলা যায় সমর্থিত হয়েছে। পাঠকালে ৮+৬ মাত্রাবিন্যাস স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং অন্ত্যযমক সৌষ্ঠব অব্যাহত পাওয়া যায়। আরেকটি প্রধান কথা হচ্ছে এখানে চরণ হচ্ছে ভাব এবং ছন্দের একক বা ইউনিট (unit ।

দ্বিতীয় উদাহরণে অন্ত্যযমক পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু প্রথাগত যতি বিন্যাস অব্যাহত থাকার দরুন চরণান্তিক বিরতি দূরীকৃত হয়নি।

তৃতীয় উদাহরণ অর্থাৎ মধুসূদনের উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করছি যে ভাব-প্রবাহযুক্ত চরণ-অতিক্রান্ত একটি বাক্য নির্মিত হয়েছে যে বাক্যটি হচ্ছে কবিতার বক্তব্যের একক বা ইউনিট (unit)। প্রথাগত যতিবিন্যাস মধুসূদন এখানে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেননি কিন্তু কাব্য-প্রবাহের প্রয়োজনে উচ্চারণগত অতিরিক্ত যতি সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ উদাহরণ প্রবহমান অমিত্রাক্ষরের উদাহরণ । এ প্রবহমানতার পূর্ণ পরীক্ষা মধুসূদন তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলোতে করেছিলেন। এ উদাহরণে যতি এসেছে ছন্দের প্রয়োজনে ততটা নয়, যতটা অর্থ এবং উচ্চারণের ভাবগত সৌষম্যের প্রয়োজনে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' মধুসূদন প্রবহমানতাকে ব্যাকরণসিদ্ধ করেছিলেন। কি ভাবে ব্যাকরণসিদ্ধ করেছিলেন তার কয়েকটি নিদর্শন আমি এখানে উপস্থিত করছি।

প্রথমত, এক চরণ থেকে অন্য চরণে দ্রুত প্রবহমানতার জন্য সমাসবদ্ধ পদের একটি পদ প্রথম চরণের শেষ এবং অন্য পদটি দ্বিতীয় চরণের প্রথমে স্থাপন করেছিলেন। যেমন—

১· যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল রবে সদা তুষেন **অচল-**
কুল ইন্দ্র হিমাচলে মহানন্দময়ী!
। ৩য় সর্গ—২৯·৩১।

২· অমনি করিয়া পান ধাতার **বচন-**
মধু ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।
। ৩য় সর্গ—১৭০·৭১।

৩· যাচিলে ফুল **দেব-**
সেনানী; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
। ৩য় সর্গ—৩৫৬·৫৮।

দ্বিতীয়ত, চরণান্তে বিশেষণ পদ এবং পরবর্তী চরণের আরম্ভে বিশেষ্য পদ স্থাপন করে প্রবহমানতা আনলেন, যার ফলে বিশেষ্য পদ উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত যতি নির্মিত হয় না। যেমন—

১· এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ **পদ্মাসনা**
বীণাপাণি?

২· পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম **কুলিশী**
পুরন্দর।

৩· শোভিল বিমল জলে **বিধুপরায়ণা**
কুমুদিনী।

৪.   উর তরে উর **পদ্মালয়া**

বীণাপাণি।

৫. অচলা চপলা তারে ভাবি, **দ্রুতগামী**

জীমুত।

তৃতীয়ত, ক্রিয়াকে তিনি এমনভাবে একটি চরণের প্রথমাংশে স্থাপন করলেন যাতে পূর্ববর্তী চরণের বিশেষ্যের বক্তব্য ক্রিয়াপদটি উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না। ফলে প্রবহমানতার সৃষ্টি হয়, যেমন—

১. কেমনে মানব আমি, ভব **মায়াজালে**

আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ-যেমতি।

যাইব সে মোক্ষধামে ?

২.   কবির **হৃদয় পদ্মাসনে**

অধিষ্ঠান কর উরি

৩. তোমার প্রসাদে মাতঃ এ **ভারতভূমি**

শুনিবে

৪.   রথচূড়া **শিরে**

শোভিল দেব পতাকা

চতুর্থত, মধুসূদন কোন কোন চরণের শেষে "সহ", "তাহে", 'সম', 'যথা', 'তথা' ইত্যাকার সংযোগ পদগুলি স্থাপন করেছিলেন যার ফলে প্রবহমানতা তৈরী হয়েছিল। যেমন—

১.   আচম্বিতে **তথা**

নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।

২.   দিনমণি **তাহে**

মণিরূপে শোভে ভানু।

৩.   পদ্মের পর্ণ **সম**

পট্টবস্ত্র।

৪.   বিভাবরী নিদ্রাদেবী **সহ**

বসিলা ধবল শৃঙ্গে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রবহমানতার একটা স্বাভাবিকতা নির্মিত হতে পারেনি। **সেজন্য কাব্যটি আদ্যন্ত সংশোধন করবার ইচ্ছা মধুসূদনের হয়েছিলো।**

প্রথম সর্গের অংশবিশেষ মাত্র সংশোধিত হয়েছিলো। সংশোধিত অংশের সঙ্গে প্রথম রচনার তুলনা করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা বিষয়ে মধুসূদনের অভিপ্রায় এবং কৌশল স্পষ্ট হবে।

প্রথম সংস্করণ ঃ

"এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদ্মাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাকসাগর আমি মথি সযতনে
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা।"

পুনর্লিখিত অংশ ঃ

"এ হেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঙ্কজ বাসিনী দেবি, এ তব কিঙ্করে?
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত যে বলে
আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে, সেই বল সম
যাচি কৃপা, দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগদেবি ঃ যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে।"

পুনর্লিখনের উদ্দেশ্য ছিলো—

১. বক্তব্য-ভাবের প্রবাহে একটি স্বাভাবিকতা আনয়ন,

২. যতি-বিন্যাসে গতানুগতিক আবদ্ধতা থেকে মুক্তি,

৩. মানুষের বাচনভঙ্গির একটি চিত্ররূপ নির্মাণ।

মধুসূদনের জীবিত কালে প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭২ শতাব্দে

বিবিধার্থ সংগ্রহের ষষ্ঠ পর্বের ৬৮ খণ্ডে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র যে আলোচনা করেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে—

"কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে পারি; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সমপ্রাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥

এস্থলে চতুর্থ পাদের "ন বিদীর্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। "কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতিস্থান নহে। রঘুবংশে যথা,

"সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে",—(১ম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক)।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমবেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং॥"

—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে যথা—

"কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥"

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং 'তিলোত্তমা'য় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!"

এই পাদ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের "বীণাপাণি" পদে অর্থ শেষ হইয়াছে: কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে", "আজি", "দেবি" ও "তোমা", পদের পর যতি

আছে, সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায় ; 'বীণাপাণি' শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্তাকে যতি-ভ্রষ্ট-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

"প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্‌টন্ কবিকৃত 'প্যারাডাইস্ লস্ট' নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই 'তিলোত্তমা'-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলত, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয় ; কেবল ইহার বিরাম চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

'তিলোত্তমা'র ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্তব্য।··· এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। 'তিলোত্তমা'র যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর্, মিল্‌টন্ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাঁহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই, তাঁহার মন হইতে অন্যের যে-কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত, সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য

বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, সুবচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্বেশ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তিসত্ত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তৃপ্ত হইবেন।"[১৩]

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি থেকে এ কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ দুটি প্রধান কারণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরকে অগ্রাহ্য করেননি। প্রথমত, সংস্কৃত কবিতায় মাত্রা উচ্চারণগত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে মাত্রাভেদ ঘটে এবং মাত্রার বিশেষ বিশেষ সমাবেশ বিশেষ বিশেষ ছন্দ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। সংস্কৃতে চরণে চরণে শেষাক্ষরের মিল বা অমিলের সঙ্গে ছন্দের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং সংস্কৃত কবিতা মিত্রাক্ষর নয়। মধুসূদন বাংলা পয়ারকে মিত্রাক্ষরের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। সুতরাং চরণগত অমিত্রতার কারণে সংস্কৃতের সঙ্গে তার একটি সাদৃশ্য নির্মিত হল। দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতগণের বিবেচনায় মধুসূদনের ছন্দে প্রচলিত পয়ারের যতি অব্যাহত রয়েছে—অর্থাৎ অষ্টমাক্ষরের যতি বিলুপ্ত হয়নি। শুধুমাত্র পদমধ্যে বক্তব্য শেষ হওয়ায় সে-সব স্থলে পৃথক যতি স্থাপিত হয়েছে। এই অধিকন্তু যতি মূল যতির পক্ষে হানিকর হয়নি।[১৪]

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' পয়ারের যতিগত সৌষ্ঠব অব্যাহত রয়েছে, অর্থাৎ ৮+৬ পদভাগ নিয়ে চরণের যে পদক্ষেপ তা অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়নি। চরণান্তরে বক্তব্যের গতিবেগ গদ্যের বাক্যের মতো বিভিন্ন স্থানে বিরাম লাভ করেছে—যার ফলে নতুনতর যতিবিন্যাস এসেছে কবিতার; কিন্তু মূল যতি দুটি কখনও মুছে যায়নি।[১৫]

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র যথার্থ বিচার কাব্যের 'মঙ্গলাচরণে' মধুসূদন নিজেই করেছিলেন—

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য, কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"[১৬]

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি-প্রকরণের সর্বপ্রথম পরীক্ষা ঘটে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'। সেদিক থেকে এ কাব্যটি আমাদের ভাষায় একটি স্থায়ী মর্যাদা পাবার যোগ্য।

২

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রতি মধুসূদনের যথেষ্ট মমতা ছিলো। এ কাব্যের মাধ্যমে তিনি যে বিশিষ্ট কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন এ রকম একটা বিশ্বাসের পরিচয় তাঁর বিভিন্ন পত্রে[১৭] পাওয়া যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সার্থক পরীক্ষা হিসাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'কে মধুসূদন সব সময় মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তা ছাড়া কাব্যে একটি দীর্ঘ কাহিনী নির্মাণ করার প্রয়াস হিসাবেও 'তিলোত্তমা'র উল্লেখযোগ্যতা ছিলো বলে মধুসূদন মনে করতেন।

২৪শে এপ্রিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে মধুসূদন যে পত্র লিখেছিলেন তার কোন কোন স্থানে 'তিলোত্তমা'র উল্লেখ আছে। মধুসূদন লিখেছিলেন,

"পুস্তকাকারে তিলোত্তমা শীগগীর প্রকাশিত হবে। তুমি সম্ভবত জাননা যে, কাব্যটি চার সর্গে সমাপ্ত। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যিনি এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন, মনে করেন যে, এর শেষ সর্গটি সর্বশ্রেষ্ঠ। বইটি অবশ্য সত্বরই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু

প্রশ্ন জাগে, ক'জন এ কাব্যটি পাঠ করবে। দুঃখ লাগে এখন তুমি কোলকাতায় নেই। থাকলে এ বই সম্পর্কে কয়েকটিই বক্তৃতা দিতে বলতাম। তাতে এর কিছু পাঠক বাড়তো। আমার ভয় হয়, তুমি সম্ভবত আমার কাব্য দুটিকে একটু কঠিন মনে কর। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি অধিকাংশ শূন্যগর্ভ অন্ত্যজদের মত অস্বাভাবিক আড়ষ্ট কঠিন ভঙ্গীতে কবিতা লিখিনা। আমাকে শব্দ-সন্ধান করতে হয় না। প্রেরণার প্রবাহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শব্দ ভেসে আসে। উত্তম অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্বরঝংকার থাকবে এবং ইংরেজী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উক্ত ভাষার কঠিনতম কবিও বটেন। আমি এখানে জন মিলটনের কথা ভাবছি। ভার্জিল এবং হোমার সে তুলনায় অনেক সহজ। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি নিশ্চয়ই প্রথম কবিতা বলে এর অনেক ত্রুটি উপেক্ষা করবে। আমি কবিতাটি অবহেলা ভরে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আমি এখন একটা কিছু করেছি যা আমাদের ভাষার কবিতাকে উঁচুতে তুলেছে এবং এর ফলে আগামী দিনের কবিকুল কৃষ্ণনগরের লোকটির ৮ কাব্যধারা থেকে একটু ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখবে। লোকটিকে অশিষ্ট কাব্যরীতির জনক বলা যায়। যদিও তিনি উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।'

রাজনারায়ণকে লিখিত আরেকটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে উপস্থিত করছি। এ পত্রটি সে বছরেরই ১৫ই মে তারিখের লেখা। "তিলোত্তমা ছাপা হয়েছে যদিও মুদ্রাক্ষরের কুক্ষী থেকে এখনো বাইরে আসেনি। যথাসম্ভব তুমি একটি কপি পাবে। যতদূর আমি জানি তুমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন লেখক। তুমি কি পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে আলোচনা করবে? তাহলে বইটির প্রচারের সুবিধা হয়। যদি সত্যি আলোচনা কর তাহলে বন্ধু বলে আমাকে রেহাই দিওনা, যেভাবে যতটুকু আমার প্রাপ্য তাই আমাকে দেবে।............

'তোমার স্ত্রী বইটির প্রশংসা করেছেন শুনে আমি বিগলিত হয়েছি। মহিলার মধ্যে তিনিই তিলোত্তমার প্রথম পাঠিকা। তাঁর অভিমত আমার সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আমাকে গর্বিত করেছে। তোমার চিঠির এ অংশটুকু

আমি রঙ্গলালকে পড়ে শোনাইনি। সে প্রায়ই আমার কাছে আসে। একসময় ছেলে বয়সে খিদিরপুরে আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম, সে আমার মাকে মা বলে ডাকতো। সে একটু আবেগপ্রবণ এবং স্পর্শকাতর। তবু আমার মনে হয় কবি হিসাবে আমাকে তার চেয়ে উঁচু স্থান দিতে তার দ্বিধা হবে না। ......মনে হয় তিলোত্তমা তার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। তার পরবর্তী কবিতাটি পড়লেই এটি বুঝতে পারবে।......

'তিলোত্তমা তোমার হস্তগত হবার পর তুমি বিধিবদ্ধভাবে অ্যারিস্টটলের ধাঁচে কাব্যটির উপাখ্যান, চরিত্র, আবেগ এবং ভাষা সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখে পাঠাবে।"

পরের মাসেই ১লা জুলাই তারিখে কবি রাজনারায়ণকে যে চিঠি লেখেন সেখানে 'তিলোত্তমা' সম্পর্কে কবির আরো বক্তব্য আমরা পাই। কবি লিখছেন :

"তিলোত্তমা' বেরিয়েছে। আমি মেসার্স' আই. সি. বসু এ্যাণ্ড কোং কে এক কপি বই তোমাকে পাঠাতে বলেছি। বইটি পেলেই তুমি তা পুরোপুরি পড়বে এবং আমাকে জানাবে যে, তোমার কেমন লাগলো। কোনরূপ বিরূপ সমালোচনায় পিছিয়ে পড়ার মানুষ আমি নই। বিশেষ করে সমালোচনাটি যখন এমন এক বন্ধুর কাছ থেকে আসছে, যে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

'এ কাব্যে মানবীয় গুণাবলীর অভাব সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে এ কাব্যের কাহিনীটি দেবতা এবং দানবদের[১৯] নিয়ে। আমি কোনক্রমেই এখানে পৃথিবীর পুরুষ এবং রমণীকে উপস্থিত করতে চাইনি।

'তুমি তোমার বন্ধুদের বোধের জন্য আমাকে এ কাব্যের ছন্দরীতি ব্যাখ্যা করতে বলেছো। আমার মনে হয় এখানে ব্যাখ্যা করবার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের ভাষা সাধারণভাবে ছন্দস্পন্দ এবং ঝোঁকের বিরোধী। বাড়ীর পুরোহিতদের আশীর্বাদকে আমরা যতটা মূল্য দেই ছন্দস্পন্দ এবং ঝোঁককেও আমরা ততটা মূল্য দেই, অর্থাৎ কিনা কোন মূল্যই

দেই না। তোমার বন্ধুরা যদি ইংরেজী জানে তাদেরে 'প্যারাডাইস লস্ট' পড়তে বলো তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে আমাদের কবিকুলরা যে ছন্দে কবিতা লিখে থাকেন তার অবস্থাটা কি। তোমাকে বলছি যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত হবে। তোমার বন্ধুদেরে কণ্ঠস্বরকে যতির স্থানে সংস্থাপন করতে বলবে তাহলেই তারা অনুভব করতে পারবে যে, এ ছন্দ কতটা মহৎ এবং বলিষ্ঠ। আমার উপদেশ হচ্ছে, অনবরত পাঠ কর। নতুন ছন্দে তোমার কানকে অভ্যস্ত কর, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে এ ছন্দের তাৎপর্য কি?''

এর পরে ১৪ই জুলাই তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, ''যখন তোমার খুশী 'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্পর্কে আলোচনা লিখতে পার। যখন তুমি আলোচনা লিখতে আরম্ভ করবে, তখন আমার মনে হয় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ চলবে। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। বিধিবদ্ধভাবে তোমার একটি অভিমত যদি প্রকাশিত হয়, তবে কিছুসংখ্যক লোক নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। তুমি হাসতে পার, কিন্তু সত্যি বলছি, তিলোত্তমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামও লোকে মুখে মুখে বলছে। রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। অনেকে বলছে মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু বেশ চতুর লোক। মনে হয় তিনি কাব্যটিকে পছন্দ করেননি।

''কবিতা লিখবার সময় আমি কখন মদ্য পান করিনা। সুরার প্রভাব থাকলে আমি কখনও কোন বক্তব্যকে শৃঙ্খলার সঙ্গে উপস্থিত করতে পারিনা। তিলোত্তমার একটি চরণও সুরার প্রভাবে লিখিত হয়নি।''

এর পরেই রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত আর একটি পত্রে মধুসূদন বিস্তারিত ভাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পত্রটির অংশবিশেষের অনুবাদ নিম্নে উপস্থিত করব :

''তোমার চিঠির জন্য তোমাকে কি ভাষায় যে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাইনি। বিশ্বাস কর, যেভাবে অকপটে তুমি বইটির ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। স্থির বিদ্যুতের যে বিবরণ আছে তা গতানুগতিক হলেও একেবারে খারাপ নয়। দ্বিতীয় পুস্তকের যে অংশে এই বর্ণনাটুকু আছে সে বর্ণনার সৌন্দর্য নির্ভর করবে

বিদ্যুতের বিবরণের উপর। তোমার সমালোচনায় তুমি ইন্দ্রের প্রতি একটু অকরুণ হয়েছে। সম্ভবত দুই ভ্রাতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে তুমি দেবতাদের রাজার প্রতি একটু বিরক্ত হয়েছ। আমিও দুভাইকে বেশ পছন্দ করি এবং একসময় ভেবেছিলাম আরো এক সর্গ যোগ করে পাঠকদের সামনে এদের আরো উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত করব। কিন্তু বন্ধু যতীন্দ্রমোহনের খরচ বাড়াতে চাইনে বলে আর কিছু বললাম না। আমি তৃতীয় সর্গের পরেই বইটি শেষ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু যতীন্দ্র জোর করে বলল যে উপাখ্যানটির একটি সমাপ্তি দরকার।

"তুমি এ কাব্যটিকে হিরোইক পোয়েম বা বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য হিসাবে গণ্য কোরনা। আমি ওভাবে কাব্যটিকে গড়তে চাইনি। এটা একটি কাব্যকাহিনী যার মধ্যে শৌর্য-বীর্যের কথা আছে। আমার কাব্যে রিরংসাজনিত আবেগের যে সমস্ত পরোক্ষ উল্লেখ আছে সেগুলো তোমার পছন্দ হয়নি। সম্ভবত কালিদাসের প্রতি তোমার পক্ষপাতের জন্যই আমার উপমাগুলো তোমার ভাল লাগেনি। যাই হোক, তোমাকে কি আমি জানিয়েছিলাম যে মাদ্রাজে থাকাকালীন আমি সংস্কৃত শিখেছিলাম? আমি অবশ্য রাজেন্দ্রলালের মতন মারাত্মক ব্যাকরণবিদ নই। কিন্তু কালিদাস পড়বার মত বিদ্যা আমার আছে এবং আমি মনে করি সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।.........

"সব কিছু বিবেচনা করলে কবিতাটি ভালোই চলবে বলতে হবে। আমি শুনেছি যে 'ব'[২৭] কবিতাটি সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করছেন। এতে আমি অবাক হইনি। তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে তিলোত্তমার লেখক কোন্ কোন্ মহৎ কবিকে অনুকরণ করেছেন অথবা কোন্ শিল্পাদর্শ তাঁর অবলম্বন ছিলো। এহেন অবজ্ঞার অভিব্যক্তিতে 'ব'-ই বেশ অনেক বিবেচনাসম্পন্ন লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। আমি তো এ রকমই শুনছি।......কোনও কোনও তথাকথিত পণ্ডিত বলছেন,—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" তাঁরা অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেন যে লেখক কেন ছন্দোবদ্ধ পদ রচনা করলেন না। তাহলে তিনি জনপ্রিয় হতেন। এসমস্ত লোক একজন

গর্বিত, সংযতবাক্ এবং নিঃসঙ্গ কবির হৃদয়কে অনুভব করতে পারে না।"

রাজনারায়ণকে লিখিত অন্য একটি পত্রে মধুসূদন বলছেন :

" 'তিলোত্তমা' বেশ চলছে। প্রথম সংস্করণ শেষ হল প্রায়। অনমনীয় বুড়ো পণ্ডিতরাও আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছেন এবং "সোমপ্রকাশ" তো বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কথাই লিখেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ এখন চালু হবার পথে। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে রঞ্জিৎ সিংহ যেমন বলতেন, 'সব লাল হো জায়েগা', আমিও তেমনি বলি, 'সব ব্লাঙ্ক ভার্স হো জায়েগা।' গত সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে বিশেষভাবে রঙ্গলালের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সে বললো, "আমি স্বীকার করি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের ভাষার মহত্তম ছন্দরীতি কিন্তু ইংরেজী কবিতা পাঠে যারা অভ্যস্ত নয় এ-ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে তাদের সময় নেবে। আমি হেসে বললাম, 'খুব যে আবশ্যক তা নয়।'......

"আমার নতুন ছন্দের গঠন প্রকৃতি অনেকেই বুঝতে চেয়েছেন। যার ফলে এ বিষয়ে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে। আমি দেখছি যে আট অক্ষরের পরই যে যতি পড়ছে তাই নয়, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১দশ, ১২শ অক্ষরের পরও যতি পড়ে, যেমন—

"জয় জয় অমরারি কার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
বজ্রী।' —তিলো—৪।

'চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।' —মেঘ—২।

'কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।' —তিলো—৪।

আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জর-গামিনী।'   —তিলো—২।

বিভিন্ন চিঠিপত্রে মধুসূদনের কাব্যশৈলীগত মন্তব্যগুলো এটাই প্রমাণ করে যে মধুসূদনই তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম সফলকাম বিচারক। মধুসূদনের বিবেচনায়—

ক. 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' বীররসাশ্রিত মহাকাব্য নয়। এটি একটি কাহিনীকাব্য যেখানে শৌর্যবীর্যের উল্লেখ আছে।

খ. 'তিলোত্তমা' দেবতা ও দানব সম্পর্কীয়। তাই এখানে মানবীয় গুণাবলীর অভাব আছে।

গ. 'তিলোত্তমায়' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সার্থক পরীক্ষা ঘটেছে।

ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার যতি-স্থাপনায়। প্রচলিত পয়ারের যতিকে অগ্রাহ্য না করে এখানে বিভিন্ন সময়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ অক্ষরের পর যতি পড়েছে।

ঙ. যেখানে সাধারণভাবে ইংরেজী ছন্দ শ্বাসাঘাতের উপর নির্ভরশীল, বাংলা ছন্দ সেখানে অক্ষরের উপর নির্ভরশীল কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে শ্বাসাঘাত সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

টীকা

১. পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বর্তমান শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য' এ শিরোনামের একটি আলোচনায় বলেছিলেন, 'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশ হইতে নতুন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকা। ১৯৪৯·পৃষ্ঠা—১)

২. মোহিতলাল মজুমদার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপরে একমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব'কে তিনি মধুসূদনের ছন্দ-সাধনার একটি প্রধান পর্ব বলে অভিহিত করেছেন। (বাংলা কবিতার ছন্দ, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ১১১-১১২)

৩. যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'মধুসূদনের জীবনচরিত' গ্রন্থে এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রগুলি উদ্ধৃত রয়েছে।

মধুসূদনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

'Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called 'Gorboduc' first introduced to Englishman the form of verse in which William Shakespeare wrote.' (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকা, ১৯৪৯, পৃঃ ১)

৪. "Surrey feels it necessary to fortify the line-limit by a regular pause at the end of each line".

(The Metres of English Poetry, Enid Hamer, Methuen & Co. London, 1954, Page—64)

৫. উদ্ধৃতিটি পূর্বোক্ত ছন্দ-গ্রন্থ থেকে।

৬. উদ্ধৃতিটি পূর্বোক্ত ছন্দ-গ্রন্থ থেকে।

৭. যোগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মধুসূদনের জীবনচরিত' থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' নাটকের ভূমিকায় উদ্ধৃত :

'I should like very much to see Blank Verse gradually introduced in our dramatic literature. I am inclined to believe that at first it should be introduced with great caution and judgment. Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in blank verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self same prose to which they are accustomed.

৮. 'পদ্মাবতী নাটক', চতুর্থাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক-কলির উক্তি, চরণ, ৬-১৩।

৯. বাংলা কবিতার ছন্দ : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা ১৯০।

১০. "So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged so think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th. Examples :

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুতরিপু
বজ্রী" ।—তিলোত্তমা : ৪

"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু" ।—তিলোত্তমা : ৪
"আইলেন যক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী" । তিলোত্তমা : ২
(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র ভূমিকা)

১১. যতির গ্রীকভাষ্য হচ্ছে 'টোমে' । একটি চরণকে দ্বিধাবিভক্ত করে উভয় অংশের ছন্দস্পন্দের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য হোমার যতির ব্যবহার করেছেন। (A Companion to Homer : Wace and Stubbing Mcmillan and Co. Ltd. London, 1963. পৃষ্ঠা 20)

১২. "The real reason for the existence of the caesura seems rather to be that hexametre is a unit whose character is maintained by the balance of its parts and that it secured its effect, as most rhythms do, by making its words run against strictly metrical divisions. Even if a poet could make each foot end with the end of a word, it would soon become insufferably monotonous and lose the variety which comes from making the rhythm dominate the whole line instead of each foot separately. The caesura helps the line to remain a unity interlocking its different parts at different points according to the metrical nature of the words used (ঐ, পৃষ্ঠা ২০)

১৩. 'মধুস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত। (মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৬৯। পৃঃ ১২১-১২২)

১৪. পণ্ডিতগণের সমর্থন যে মধুসূদনকে উল্লসিত করেছিল তা তাঁর একটি পত্রে পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখছেন : "You will be pleased to hear the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned

Vidyasagar has at last condescended to see 'Great Merit' in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is gowing popular.' ('তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত)।

১৫. মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন—"মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের চরণ কোনখানেই অমিতাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর হইলে উহার ওই পয়ারের কাঠামোটার কোন প্রয়োজন হইত না। ঐ ১৪ অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, তেমনই ঐ পদভাগও (৮+৬) অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই। চরণের ওই পদক্ষেপ—উহার অবয়বের ওই অঙ্গসন্ধিই—এ ছন্দের স্বাধীন গতিভঙ্গির একটি বড় সহায়, কারণ 'freedom' এর সঙ্গে ঐ 'form' আছে বলিয়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ করিয়াছে। নূতনতর যতিবিন্যাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর সঙ্গতি দান করিয়াছে তেমনই (৮+৬) এর যতি দুইটি ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়াছে"। (বাংলা কবিতার ছন্দ: শ্রীমোহিতলাল মজুমদার: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ১৩৫৫: পৃঃ ১০৬।)

১৬. 'মঙ্গলাচরণ'টি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিলো।

১৭. বর্তমান আলোচনায় উদ্ধৃত 'তিলোত্তমা' সংক্রান্ত সব কটি পত্র রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত। পত্রগুলো যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন চরিতে' আছে। প্রয়োজনীয় অংশগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

১৮. মধুসূদন এখানে ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯. মধুসূদনের ভাষায় Gods and Titans।

২০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মেঘনাদবধকাব্যে মানবভাগ্য

গ্রীক পুরাণে শুক্লবসনা তিনজন ভাগ্যদেবীর উল্লেখ আছে যারা কর্মসূত্রে এবং দায়িত্বপালনে একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জীবনের সুতো যার হাতে তার নাম ক্লোথো। জীবনের পরিমাপ যে করছে তার নাম ল্যাকেসিস এবং যাকে কখনও এড়িয়ে যাওয়া যায় না তার নাম এট্রোপোস। মহাপ্রভু জীউস মানুষের জীবনের সর্বনিয়ন্ত্রণকারী দেবতা। বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তিনি ভাগ্যদেবীগণকে জানিয়ে দেন।[১]

ফেইট হচ্ছে অদৃষ্ট—নিয়তি। দুর্জয় দ্বিধাহীন, অশেষ শক্তিধর দৈবই মনুষ্যজীবনে সর্বাপেক্ষা বলবান। পুরুষকার দৈবের সম্মুখে ব্যর্থকাম হয়, মনুষ্যের সকল শক্তি, ধর্মাধর্মবোধ নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাহলে দেখছি নিয়তি হচ্ছে এক প্রকার পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিধান। প্রাচীন গ্রীক কাব্যে নিয়তি কখনো কখনো দেবতাদের ইচ্ছা বা আদর্শের বিরোধী ছিল। 'হোমার'-এর হাতে এর পরিবর্তন ঘটে। 'হোমারে'র কাব্যে নিয়তি এবং দেবতা সহগামী এবং একই সাধিকা শক্তির অংশ। 'হোমার' এই উভয় শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করেননি।

'নেমেসিসে'র[২] অর্থ হচ্ছে প্রতিফল অথবা দেবতাদের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ—মহাপাপের সেই শাস্তি যা অন্যায়কারীকে কোন না কোন সময়ে স্পর্শ করবেই। গ্রীক পুরাণে 'নেমেসিস' হচ্ছেন অধোভুবনের দেবী, রাত্রি এবং জিঘাংসা দেবীর কন্যা যিনি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ করেন এবং অবিমৃষ্যকে শাস্তি দেন। 'নেমেসিসে'র পূর্ব অবস্থাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'আইডস', যার অর্থ হচ্ছে লজ্জা বা সম্মানবোধ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রমুক্ত, তখনই 'আইডস' ও 'নেমেসিস' ক্রিয়াশীল হয় এবং

মানুষ তখনই সম্পূর্ণ স্বাধীন যখন কোন দিক থেকে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। যে ব্যক্তি সমস্ত নীতি ও শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করেছে, যে কখনো কোন বস্তু বা ঘটনার সম্মুখে সন্ত্রস্ত নয়, যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, 'নেমেসিস' সাধারণত তার মধ্যেই প্রকাশ পায়। দেখা যাবে যে তার স্বাধীন গতির মধ্যে হঠাৎ এমন কিছু ঘটবে যা তাকে সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানেই হোক, অস্বস্তি দেবে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাই 'নেমেসিসে'র ইঙ্গিত বহন করে। গ্রীক সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ কারণে 'নেমেসিস' সক্রিয় হয়; প্রথমত, ভীরুতা ও মানসিক দুর্বলতা; দ্বিতীয়ত, মিথ্যাভাষণ ও কর্তব্যের মধ্যে মিথ্যার আভাস; তৃতীয়ত, অসম্ভ্রমবোধ ও রূঢ়তা; চতুর্থত, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা। উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের মনে লজ্জা অথবা অস্বস্তির ভাব জাগরিত হতে পারে। এই অস্বস্তির ভাব থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায় আছে—কারণগুলো থেকে দূরে থাকা অথবা তাদের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অদৃষ্টের প্রতিশোধ বা পরিহাস জাজ্বল্যমান হয়।

'ভার্জিল' এর 'ইনিদ' এর মধ্যে 'fatum' বলে একটি কথা আছে।* এ শব্দটি গভীর অর্থবাচক। এর কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হচ্ছে Destiny—মানবভাগ্য। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করিনে কেন, এ শব্দটির পুরোপুরি অর্থ-জ্ঞাপন কখনোই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা ভাগ্য আছে, যদিও কোন কোন লোক বিশেষ ভাবে 'নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ'। 'ইনিস' একজন নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ, কেননা 'ভার্জিলে'র চক্ষে তার উপর পাশ্চাত্য জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে; কিন্তু এই নিয়তি-নির্দিষ্টতাকে কোনক্রমেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এক অর্থে এটা দায়িত্বভার সম্পর্কে সজ্ঞানতা। এটা আত্মপ্রশংসা বা অহমিকাবোধ জাগাবে না, কেননা 'ভার্জিল' ভাবছেন যে কোনো একটা বিশেষ দায়িত্ব যার উপর আরোপিত হয়েছে, তার কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দায়িত্ব যার উপর অর্পিত হয়েছে, সে কাজ করবে যন্ত্রস্বরূপ বা নির্দেশবহরূপে। যে মুহূর্তে সে নিজেকে সমস্ত শক্তির উৎস বলে মনে করছে এবং একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবে, তখনই

সে নির্যাতিত হবে এবং সর্বস্বান্ত হবে। ইনিস ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সে কখনো নিজেকে কোনো শক্তির উৎস বলে মনে করে না। সে জানে যে ভাগ্যকে কামনা করে পাওয়া যায় না, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকে অতিক্রমও করা যায় না। তাহলে সে কোন শক্তির দাস হল? দেবতাদের নয়, কেননা অনেক সময় দেবতাও তো যন্ত্রস্বরূপ। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ভাগ্যের কল্পনা মূলত রহস্যাবৃত, কিন্তু এমন রহস্য যা যুক্তিবিরোধী নয়, কেননা আমরা ভাগ্যের সচলতা এবং সক্রিয়তা থেকে একটি তথ্য জেনেছি যে এই পৃথিবী এবং মানুষের ইতিহাসের ধারার গভীর অর্থ আছে।[৪]

গ্রীক সাহিত্যে নিয়তির বিচিত্র লীলায় মানুষ অত্যন্ত অসহায়। নিয়তি সেখানে পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিধান, যাকে কোনক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। মানুষ জানে যে নিয়তি-নির্দেশ কখনোই অতিক্রান্ত হতে পারে না; কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও সে অন্ধভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে নিয়তির বিরুদ্ধাচারণ করে অথবা তাকে অতিক্রম করতে চায়। অবশেষে বিপুল শক্তিধর নিয়তি মানুষকে চরমভাবে নিঃশেষ করে এবং তখন মানুষের পরাজয়, হাহাকার এবং যন্ত্রণায় আমরা ভীত হই। একটি উদাহরণ দিলে এ কথাটি স্পষ্ট হবে: 'ইদিপাস'-এর কাহিনী আমরা জানি। সেখানে মানুষের অসহায়তা চরমভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'ইদিপাস' হচ্ছে 'লেয়াস্' এর তার স্ত্রী 'জুকাষ্টা'র পুত্র। নবজাতকের নামকরণের পূর্বেই 'এপোলো'র দৈববাণী এলো যে ভাগ্যচক্রে একদিন এ পুত্র তার পিতাকে হত্যা করবে এবং বিধবা মাকে বিয়ে করবে। 'এপোলো'র দৈববাণী 'লেয়াস্' অবিশ্বাস করেননি, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তিনি এক মেষপালককে নির্দেশ দিলেন পুত্রকে পর্বতপ্রান্তে পরিত্যাগ করে আসতে। ভাগ্যের নির্দেশ অন্যথা হলো না, তাই থীবীর মেষপালক করুণাপরবশ হয়ে শিশুকে এক করিন্থিয়ান মেষপালকের হস্তে সমর্পণ করলো। করিন্থিয়ান মেষপালক ছিল করিন্থের সন্তানহীন নৃপতি 'পলিবস'-এর আজ্ঞাবহ। সে শিশুকে পলিবসের হাতে সমর্পণ করলো। 'পলিবস' শিশুকে দত্তক

গ্রহণ করলেন এবং নাম দিলেন 'ইদিপাস'। 'ইদিপাস' যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং করিন্থের যুবরাজ বলে সর্বত্র মান্য হলেন। এ সময় তিনি 'এপোলো'র দৈববাণী শুনতে পেলেন যে তিনি পিতৃঘাতী হবেন। তিনি দৈববাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে পালক পিতাকে আপন পিতা ভেবে করিন্থ পরিত্যাগ করলেন। নির্দেশবিহীনভাবে পরিভ্রমণরত অবস্থায় থীবীর সীমান্তে তিনি তাঁর যাত্রায় বাধাপ্রদানরত এক পথচারীকে হত্যা করেন। এই পথচারী ছিলেন তাঁর পিতা। ভাগ্যকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে চরম নিষ্ঠুরতায় ভাগ্য প্রকাশমান হলো। থীবীর অভ্যন্তরে এসে তিনি দেখেন যে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় চলছে। ভয়াবহ স্ফিংসের জন্য দেশবাসী সন্ত্রস্ত। স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর কেউ দিতে পারছে না এবং অপারগ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে ইদিপাস স্ফিংসের শক্তি অপহরণ করলেন এবং সকৃতজ্ঞ থীবীবাসিগণ তাঁকে রাজা বলে গ্রহণ করলো। 'ইদিপাস' রাজা হয়ে লেয়াসে'র পত্নী 'জুকাষ্টা'কে বিয়ে করলেন। 'ইদিপাসে'র ঔরসে 'জুকাষ্টার' গর্ভে পুত্রকন্যার জন্ম হলো। 'ইদিপাসে'র অজ্ঞাতসারে দৈববাণী সফল হলো। এখন বাকী রইল 'ইদিপাসে'র কাছে সমস্ত সত্য স্পষ্ট হওয়া। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইদিপাস সর্বতোভাবে নিরীহ। তিনি ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং জনকল্যাণী। তাঁর নিজের দোষে নয়, কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশে তিনি চরমভাবে নিঃশেষিত হচ্ছেন। সমস্ত সত্য যেদিন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো, সেদিন তাঁর কোন প্রকার ত্রাণের উপায় নেই। নিয়তি তাঁকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছে আপন সত্যকে স্পষ্ট করবার জন্যে এবং অসহায় ইদিপাস লাঞ্ছিত এবং নিঃশেষিত হয়েছেন। নিয়তি এখানে অমোঘ, একাগ্র, নির্মম এবং নিশ্চিন্ত। যন্ত্রণার বিচিত্র বিকাশের মধ্যে 'ইদিপাসে'র অসহায়তা দেখে আমরা বিহ্বল হই এবং চরমভাবে শঙ্কিত হই। নিয়তি যা বিশ্ববিধানের এই দুর্বার গতি এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগের সম্মুখে মানুষ বাত্যাতাড়িত তৃণের মতো।[৫]

'শেক্সপীয়রে'র নাটকেও নিয়তিলাঞ্ছিত মানুষের পরিচয় পাই। সেখানেও মানুষ অসহায়; কিন্তু সেখানে তার অসহায়তার জন্য সে নিজেই দায়ী। শক্তিমান নায়ক নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসী হ'য়ে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু আপন চরিত্রের কোনো বিশেষ দুর্বলতার কারণ সে এমন একটা পথ অবলম্বন করেছে যে পথে তার জন্য সর্বনাশ আছে কিন্তু আনন্দ নেই। সে জানে যে এ পথে সর্বনাশ আসতে পারে, তাই সর্বনাশ রোধ করবার চেষ্টায় তার অন্ত নেই; কিন্তু আপন রিপুর কাছে সে একান্ত অসহায়, তাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। আমরা এখানে ম্যাকবেথের উদাহরণ আনতে পারি। ম্যাকবেথ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ন্যায়বান আদর্শ পুরুষ; কিন্তু তার হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষারূপ দুর্বলতা আছে। এ দুর্বলতাকে সে কোনোক্রমেই অতিক্রম করতে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এ দুর্বলতার কারণেই অনবরত অন্যায় পথে তার পদচারণ ঘটলো। এ নাটকে আমরা ভাগ্যের সামনে মানুষের অসহায়তার চিত্র দেখি; কিন্তু এ নিয়তি সে নিজেই নির্মাণ করেছে।[৬]

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মাইকেল মধুসূদন দত্ত অল্প পরিসরের মধ্যে গ্রীক নিয়তিকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে এ কাব্যে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের শাস্তি এবং কৃতকর্মের ফলভোগ আছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে এই পূর্বজন্মের কথা এবং কৃতকর্মের কথাই পাই; কিন্তু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে এগুলো উক্তি স্বরূপেই আছে, মহাকাব্যের ঘটনা-সংস্থানে এগুলোর কোন পরিচয় নেই। তবুও এ উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আমাদের প্রথম প্রমাণ করতে হবে যে এই প্রাক্তন এবং কৃতকর্মের ফলভোগ বিভিন্ন ঘটনা বা আবেগের মধ্য দিয়ে সমর্থিত হয়নি। এটা প্রমাণ হলেই প্রাক্তনগত সমস্ত উল্লেখকে আমরা বর্জন করতে পারবো এবং তারপরেই আমাদের প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে যে এ কাব্যের ঘটনা সংস্থানে, বিভিন্ন সংঘাতে এবং চরিত্রগত আবেগে গ্রীক নিয়তিবাদ সমর্থিত হয়েছে কি হয়নি।

প্রথম সর্গে প্রাক্তন-সংক্রান্ত উক্তিগুলো এই :

১. রাবণের উক্তি :

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি।
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই?
... ...
হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে?"[৭]

২. চিত্রাঙ্গদার উক্তি :

"কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব?
... ...
তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষস-কুলে, মজিলা আপনি।"[৮]

৩. রমার উক্তি :

"যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"[৯]

রাবণের উক্তিতে আত্মকৃত অন্যায় এবং পাপবোধ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা আছে : কিন্তু রাবণের চেতনায় পাপ সম্পর্কে কোনো প্রকার সজ্ঞানতা নেই। রাবণ মূলত অভিযোগ করছে যে ক্রমান্বয়ে সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কেন? সীতাকে যে অপ্রহরণ করে নিয়ে এলো সে সম্পর্কেও রাবণের অপরাধের মনোভাব নয়। সে দোষারোপ করছে সূর্পণখাকে। সূর্পণখা পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণকে দেখে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; কিন্তু লক্ষ্মণ তার নাসিকা কর্তন করে। সে জন্যেই সূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হয়ে সীতাকে অপহরণ করে রাবণ। এ অপহরণের ব্যাপারে রাবণের মনে কোনো প্রকার পাপবোধের পরিচয় নেই। রাবণের বক্তব্য হচ্ছে, সূর্পণখার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সে সীতাকে অপহরণ করেছে। এখানে কোন প্রকার অসদাচরণ অথবা মানসিক বৈকল্যের পরিচয় নেই। অপহৃত সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র এসেছে লঙ্কায় এবং সেখানে উভয় পক্ষের সংগ্রামে রাবণ ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হচ্ছে। সামর্থ্য তার অশেষ, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও কেন যে সে ক্রমান্বয়ে পরাজিত হচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রামের সঙ্গে বিরোধের কারণ সে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বল নাট্যশালা' রূপ সুন্দর লঙ্কাপুরীর সমস্ত 'দেউটি' কেন যে নিভে যাচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রাবণের উক্তিতে প্রাক্তনের বোধ নেই অথবা কৃতকর্ম-জনিত শাস্তিরও সচেতনতা নেই।

চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে রাবণের উপর দোষারোপ আছে। চিত্রাঙ্গদা স্পষ্টভাবেই বলছে, সীতাকে অপহরণ করা হয়েছে বলেই লঙ্কাপুরে আজ কালাগ্নি জ্বলেছে। নিজ কর্মফলে রাবণ সমস্ত রাক্ষসকুলকে আজ সর্বস্বান্ত করেছে। এটা ক্ষুব্ধ এবং বেদনালাঞ্ছিত মাতার উক্তি। এটা উক্তি স্বরূপই রয়েছে, রাবণের দিক থেকে এর কোনো প্রতিক্রিয়া জাগেনি। যতটুকু প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা হচ্ছে রাক্ষসকুলের মানরক্ষার জন্যে আবার নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি। রাবণ এই উক্তির উত্তরে কর্মফলের কথা উল্লেখ করেনি। ক্ষোভে অভিমান শোকার্ত রাবণ বলছে :

'এত দিনে'। (কহিলা ভূপতি)
'বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!'[১০]

দেবতারা অবশ্য অনবরত রাবণের পাপের কথা বলছেন, তার কর্মফল এবং ভাগ্যদোষের কথা বলছেন; কিন্তু এ-কাব্যের গতিবিধিতে এবং রাবণের চরিত্র প্রকাশের মধ্যে এর সমর্থন আমরা পাই না। গ্রীক কাব্যের মধ্যে দেবতারা কোনো একটি পক্ষের সমর্থক কখনও নন, মানুষে মানুষে দলভাগের মতো দেবতারাও সেখানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন; তাই ভাগ্য সেখানে দেবতাদের কৃত্যরূপে প্রকাশিত হয় না, আমরা সেখানে ভাগ্যের একটি বিচ্ছিন্ন সর্বগ্রাসকারী অবশ্যম্ভাবী রূপ পাই। মধুসূদন তাঁর সমস্ত দেবতাকে এক বিশেষ ষড়যন্ত্রসূত্রে গ্রথিত করেছেন; তাই যেখানে দেবতারা প্রাক্তনের ফলকে প্রকাশমান করবার জন্যে ছুটে চলেছেন, সেখানে মূলত তাঁরা আপন ষড়যন্ত্রকেই সফলকাম করছেন। এ কারণে আমরা বলতে পারি যে রাবণের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় সম্পর্কে তাঁরা যে সমস্ত কথা বলছেন, সেগুলো মূলত তাঁদের ষড়যন্ত্রের সমর্থনসূচক। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে একে অন্যের সমর্থনে এবং নির্ভরতায় এবং বিশেষ এক যুক্তিধারা অবলম্বন করে রাবণের অজ্ঞাতসারে তাকে চরম ভাবে নিঃসম্বল করছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ পূর্ণভাবে সর্বস্বান্তই হয়েছে বলা যেতে পারে। এ কারণেই দেবতাদের উক্তিকে এখানে ভাগ্যের নির্দেশ বলে মানা যেতে পারে না; আর যদি কৃতকর্মের ফলের কথাই বলি তাহলেও বলতে হয় যে রাবণের চরিত্রবিকাশের মধ্যে এর আভাস মাত্র নেই। দেবতারাই অনবরত বলছেন যে লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ এবং রাবণ তার অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি পাবেই: কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও লঙ্কাপুরীর পাপক্রিয়ার অথবা রাবণের কোনো প্রকার বিকল আচরণের পরিচয়

নেই। রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ-সূত্রে আমরা দেখছি যে রাবণ দেশপ্রেমী, প্রজাবৎসল, শক্তিধর এবং অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। করুণা এবং সহানুভূতিতে সে যেমন আশ্চর্যরকম কোমল এবং মানবীয় তেমনি শত্রুর সম্মুখে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করার ক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্ত।

এখানে 'হোমারে'র দেব-কল্পনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। 'হোমারে'র দেবতারা অমর সন্দেহ নেই; কিন্তু মানব রূপে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ সৌন্দর্যে এবং দেহগত রূপে তারা মানবকল্প। তাদের ক্ষমতা প্রায় অসীম এবং রূপের প্রভাও যথেষ্ট; কিন্তু মানুষের মতো তাদের দুর্বলতা আছে এবং কর্মপন্থার কারণ আছে। তারা মানুষের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত এবং মানবের কার্যধারায় ন্যায়ানুসরণ তাদের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।[১]

দেবতাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এখানে যে দেবতারা শঙ্কামুক্ত এবং আনন্দময়, অন্য পক্ষে মানুষ কর্মে, আকাঙ্ক্ষায় এবং আকুলতায় নিয়ত পীড়িত। এই পার্থক্য 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' দুই মহাকাব্যেই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ওদিসি'র মধ্যে এই পার্থক্য আশ্চর্য সজীবতায় বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চম পুস্তকে যেখানে 'ওদিসিয়াস' 'কেলিপ্সো'র অমরত্বের দানকেও অস্বীকার করছে। 'ওদিসিয়াস' দেবতাদের অমরত্ব এবং অনন্ত যৌবন কামনা করেনি।

'ওদিসি'তে সর্বশক্তিমান দেবতা 'জিউস'। 'জিউস' হচ্ছে 'ক্রোনোসে'র পুত্র। 'জিউস' সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের প্রভাবমুক্ত নন, যদিও তিনি মানুষের ভাগ্যকে পরিচালনা করেন। তিনি করুণাপরায়ণ, ন্যায়বান। ভাগ্যের নির্দেশে তিনি মানুষকে হয়তো শাস্তি দেন অথবা যন্ত্রণা দেন, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পরিকল্পনা বা কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত। 'জিউসে'র সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক কি, তার পরিচয় 'ইলিয়দে'র ষোড়শ পুস্তকে কিছুটা পাওয়া যায়। 'সারপেদন'কে বিপদগ্রস্ত দেখে 'জিউস' তার স্ত্রী হেরে-কে বলছে:

'ভাগ্য আমার প্রতি অকরুণ। সারপেদনকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি

অথচ তাকে বাঁচাবার উপায় নেই। দেখতে পাচ্ছি যে পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত, আমি কি তাকে জীবিতাবস্থায় যুদ্ধের বেদনা ও অশ্রু-প্রবাহ থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার সজীব ভূমিতে সরিয়ে আনব? না, পেত্রোক্লসের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?"

উত্তরে হেরে বলছে :

"তুমি আমাকে অবাক করছো। যার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, যে পতিত হবে যুদ্ধে, তাকে কি তুমি মৃত্যুর বেদনা থেকে রক্ষা করতে চাও? যদি তুমি সারপেদনকে ভালোবাস, তবে তোমার কর্তব্য হবে ভাগ্য-নির্দেশ মতো পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া।"

এখানে আমি এদের সংলাপটুকু E. V. Rieu-এর 'ইলিয়দে'র ইংরেজী অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি :

"The son of Cronos of the Crooked Ways saw what was happening and was distressed. He sighed and said to Here, his sister and his wife : 'Fate is unkind to me—Sarpedon, whom I dearly love, is destined to be killed by Patroclus, son of Menoetius. I wonder now—I am in two minds. Shall I snatch him up and set him down alive in the rich land of Lycia far from the war and all its tears? Or shall I let him fall to the son of Menoetius this very day?' 'Dread son of Cronos, you amaze me!' replied the ox-eyed Queen of Heaven. 'Are you proposing to reprieve a mortal man whose doom has long been settled, from the pains of death?...No; if you love and pity Sarpedon, let him fall in mortal combat with Patroclus, and when the breath has left his lips send

Death and the sweet god of sleep to take him up and bring him to the broad realm of Lycia, where his kinsmen and retainers will give him burial, with the barrow and monument that are a dead man's rights.'[১৯]

[ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখতে পেয়ে ক্রোনোসের পুত্র বিষাদ-ভারাক্রান্ত হলো। সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে হেরেকে, যে একই সঙ্গে তার ভগ্নী ও স্ত্রী, বললো, 'ভাগ্য আমার প্রতি নিষ্করুণ—কারণ যে সারপেদনকে আমি এত ভালোবাসি, মিনতিয়াসের পুত্র পেত্রোক্লসের হস্তে তার মৃত্যু অবধারিত। আমি এখন চিন্তিত হচ্ছি—আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত। আমি কি তাকে জীবন্ত অবস্থায় যুদ্ধের বিষাদ এবং অশ্রুর বন্যা থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার উর্বর-ভূমিতে নিয়ে আসতে পারবো? না, মিনতিয়াসের পুত্রের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?

স্বর্গের রানী জবাব দিলেন, 'হে ক্রোনোসের ভীষণ পুত্র, তুমি আমাকে অবাক করছো। অনেক দিন পূর্ব থেকেই যার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে, সেই মরণশীল মানুষকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাও?…না, যদি তুমি সারপেদনকে ভালোবাস এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হও, তবে তোমার কর্তব্য হবে বিধিলিপি অনুসারে পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। এতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু এবং নিদ্রাদেবতা এসে তাকে লিসিয়া রাজ্যে নিয়ে যাবে! সেখানে তার আত্মীয়স্বজন তাকে সমাহিত করবে এবং তার সমাধির উপর গড়ে উঠবে বিরাট স্মৃতিসৌধ।]

এখানে আমরা দেখছি যে নিয়তি হচ্ছে একটা বিশেষ সত্য যা নিশ্চল, অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বব্যাপ্ত, যাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়, অথচ মানুষ অনবরতই তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে এবং এই অতিক্রমের চেষ্টায় লাঞ্ছিত এবং বিপর্যস্ত হচ্ছে। গ্রীক কাব্যে দেখতে পাই, মানবের নিয়তি সম্বন্ধে দেবতারা অবহিত। দেবতাদের কেউ নিয়তিকে অসফল করতে চাচ্ছে আবার কেউবা নিয়তিকে সমর্থন করছে। নিয়তিকে

সমর্থন করতে যেয়েও কখনো কখনো কোনও কোনও দেবতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু সর্বপ্রকার আপত্তি এবং দ্বিধাকে অতিক্রম করে নিয়তি প্রকাশমান হচ্ছে। এক কথায় পৃথিবীর অস্তিত্বের মত নিয়তিও সুনিশ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য। নিয়তির এই রূপ 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' কাব্যের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রকাশমান হয়েছে।

'ইনিদ' কাব্যে নিয়তিকে সত্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে—দিবারাত্রির মত সত্য এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের মত সত্য। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দেবতার নির্দেশ মানা। দেশকে ভালোবাসা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং অনুচরদের প্রতি সত্য-সম্বন্ধে অর্থাৎ করুণায়, মমতায় ও সমর্থনে বিজড়িত থাকা, তবেই নিয়তির স্বরূপটি প্রকাশমান হবে তার কাছে কেননা সে সব দিক থেকে 'সত্য'। এ সত্যকে কিন্তু উপলব্ধি করতে হয় এবং সে জন্যই ইনিসের মতো বলিষ্ঠ প্রাণবান ব্যক্তিকে ভার্জিল তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন। ইনিস হচ্ছে ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষ এবং ইনিস তা নিজেও অনুভব করে। দেবতারা স্বপ্নে, অনুভূতিতে, প্রেরণায় এবং ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময়ে এ সত্য তার কাছে স্পষ্ট করে। ইনিস ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষরূপে ইতালীতে একটি সাম্রাজ্য জয় করবে। দৈবশক্তি তাকে পথের নির্দেশ দেয় এবং তাকে সাহায্য করে। একটি প্রচণ্ড সমুদ্র-ঝড়ে বিভ্রান্ত হয়ে ইনিস তার দলবলসহ উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ বন্দরে পদার্পণ করলো। এখানে ইনিস কার্থেজের রানী 'দিদো'র প্রণয়াসক্ত হলো। ইনিস এবং দিদো একত্রে বসবাস করতে লাগলো। ইনিস ভুলে গেলো যে নিয়তি তাকে ইতালীতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং সেখানে সে নতুন সাম্রাজ্য জয় করবে। অনেক দিন চলে যায়, তারপর নিয়তির নির্দেশের কথা ইনিসের স্মরণে আসে। ইনিস দিদোকে পরিত্যাগ করে এবং আবার সমুদ্রযাত্রায় নামে। বঞ্চিতা দিদো ইনিসকে অভিশাপ দেয় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করে।

ইনিদ কাব্যে ভাগ্যের এই গতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ইনিস নিয়তির নির্দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইনিসের

যাত্রাপথ নিয়তি-নির্ধারিত, কখনো কখনো বৈলক্ষণ্য এলেও দৈবরোষ প্রবল হয় এবং বলিষ্ঠ নায়ক বিশ্ববিধান সমর্থিত পথে আবার যাত্রা করে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' দুটি চরিত্রের বিকাশে এই নিয়তি-নির্ধারিত পথ-বিন্যাসের স্বরূপ স্পষ্ট হয়। একজন হচ্ছে লক্ষ্মণ, অন্য জন ইন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণ বিশ্বাস করে যে সে নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ, দৈববলে বলী এবং এ কারণে সে জয়লাভ করবেই। ইন্দ্রজিৎকে গোপনে হত্যার জন্যে যখন লক্ষ্মণ রামের কাছে অনুমতি চাচ্ছে তখন ভীত সন্ত্রস্ত রাম বলছে :

'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।'[১৩]

এর উত্তরে লক্ষ্মণের উক্তি হচ্ছে :

'দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবনে? দেব কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল-মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেবহাস্য উজলিছে; দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?'[১৪]

এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষ্মণ নিয়তির নির্দেশ সম্বন্ধে সচেতন এবং সে নিয়তির উপাদানরূপে কাজ করছে, তাই আমরা অনুভব করতে পারি যে তার জয় সুনিশ্চিত। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মেঘনাদের বিদায়দৃশ্য। মেঘনাদের মানসচেতনা বিপরীত অনুভূতিতে

পরিপূর্ণ। সে একমাত্র নিজের শক্তির উপরই বিশ্বাসী। সে নিজেকে কোন বিশেষ শক্তির উপাদানরূপে কল্পনা করতে পারে না—সে নিজেকে জানে সমস্ত শক্তির উৎসরূপে এবং এ কারণেই তার পতন ঘটেছে। তার মাতা যখন বলছে ঃ

'কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।'[১৫]

তার উত্তরে মেঘনাদ বলছে ঃ

'কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?'[১৬]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্মণের দিক থেকে নিয়তি-নির্দিষ্ট একটা দায়িত্বভার সম্পর্কে সজ্ঞানতা আছে। লক্ষ্মণের কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা অর্থাৎ লক্ষ্মণ হচ্ছে নির্দেশবাহক। অন্যদিকে মেঘনাদ নিজেকেই সমস্ত শক্তির উৎস মনে করছে, তাই সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। সে ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত নয়, সে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল। যান্ত্রিক অনুগামিতায় লক্ষ্মণ জয়ী আর একান্ত আত্মপ্রত্যয়ে মেঘনাদ পরাভূত। এই বিরোধাভাসে উভয়ের চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্মণের নিশ্চিন্ত দেব-নির্ভরতার পরিচয় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্বত্রই আমরা পাই। রাম বহুবার যুদ্ধ পরিহার করতে চেয়েছে বিপর্যয়ের ভয়ে এবং বহুক্ষেত্রেই পরাজয় তার কাছে সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে; কিন্তু লক্ষ্মণ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস করেছে যে মেঘনাদের ধ্বংস তার কাছে অনিবার্য, কেননা দেব-কুল তার সহায়। তৃতীয় সর্গে রাম, প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা দেখে চিন্তিত হয়ে বিভীষণকে বলছে:

'দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান গিরি
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ পালে?'[১৭]

এর উত্তরে সৌমিত্রি শূর বলছে:

'কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি।'[১৮]

এ ভাবে দেখা যায়, লক্ষ্মণ এবং মেঘনাদের শক্তির উৎসকেন্দ্রে দ্বৈতাভাস আছে এবং কবি এই দ্বৈতাভাসের মধ্যদিয়ে নিয়তির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। উভয় চরিত্রের আবেগের বিকাশ এবং পরিণতিতে যদিও আদর্শগতভাবে নিয়তির অপরিহার্যতার পরিচয় আছে, কিন্তু নিয়তির নির্দেশকে সার্থক করতে গিয়ে লক্ষ্মণ যে পন্থা অবলম্বন করেছে এবং যার অনুসরণে অবশেষে মেঘনাদের পতন ঘটল, তার সঙ্গে নিয়তির অমোঘ রূপের কোন সম্পর্ক নেই। যদি নিয়তির নির্দেশ এই হয়ে থাকে যে লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের পরাজয় ঘটবে তাহলে লক্ষ্মণের গোপন ষড়যন্ত্র এবং কাপুরুষোচিত আচরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিয়তির অনিবার্যতার পরিবর্তে এখানে প্রধান শক্তিরূপে স্পষ্ট হচ্ছে

দেব-কুলের গ্লানিময় গোপন অসদাচারণ। দেবতারা সর্বশক্তিমান এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই সর্বশক্তিমান দেবতারা—বারুণী থেকে আরম্ভ করে মহাদেব পর্যন্ত—একটি নিকৃষ্টতম গোপন ষড়যন্ত্রে একত্র হয়েছে এবং এদের সকলের সুবিন্যস্ত এবং সুনিশ্চিত কার্যধারায় মেঘনাদ নির্বীর্য এবং নিঃশেষ হয়েছে। এ কাব্যের কোথাও ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় নেই এবং মানব ভাগ্যের চিত্রাঙ্কনে মধুসূদন ব্যর্থকামই হয়েছেন বলতে হবে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাদেবের কল্পনা গ্রীক দেবপ্রভু 'জিউস' থেকে নেয়া; কিন্তু যেখানে 'জিউস' বিশ্ববিধানকে প্রকাশমান এবং কার্যকরী করেন মাত্র এবং যে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দায়িত্ব কিছু নেই, সেখানে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাদেবের কার্যকারণের মধ্যে নিয়তি সমর্থনের স্পষ্ট কোন পরিচয় নেই! আমরা দেখেছি সারপেদনের পরিণতি জানতে পেরে জিউস দেবতার আক্ষেপ এবং মনোবেদনা। জিউস সেখানে সারপেদনকে রক্ষার জন্যে চেষ্টা করছেন এবং ভাগ্যকে কোনও ক্রমে অস্বীকার করা যায় কিনা তার চিন্তা করছেন। অবশেষে যখন দেখা গেল যে ভাগ্যকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তাঁর নেই তখন তিনি সারপেদনের পতনকে মহীয়ান করলেন। আমরা সেখানে জিউসের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের অনিবার্যতার একটি সুন্দর পরিচয় পাই। জিউস সেখানে কোন কর্মের নায়ক নন, ভাগ্য-নির্দেশে তিনি একজনের পতনকে সম্ভবপর করছেন মাত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাদেবের উক্তি এই :

"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন;
কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি; হায় দেবি, দেবে কি মানবে,

কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।[১৯]"

এখানেও দেখছি, অন্যান্য দেবতার মতো মহাদেবও রাবণের পাপের কথা বলছেন, যে পাপের ব্যাখ্যাসূত্র আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। অব্যাখ্যাত এবং অসমর্থিত পাপের কারণে সর্বনাশ হচ্ছে—এখানে গ্রীক নিয়তি বা প্রাক্তন কোন কিছুরই পরিচয় নেই; মহাদেবের আচরণে এটাই স্পষ্ট হয় যে তিনি ভাগ্যকে রূপ দিচ্ছেন না; কিন্তু সমস্ত দেবশক্তির ষড়যন্ত্রের সমর্থক হয়েছেন। মেঘনাদ বা রাবণের জন্যে তাঁর কোন অনুকম্পা নেই, তিনি নিশ্চিন্তে মেঘনাদের সর্বনাশের নির্দেশ দিচ্ছেন। রাবণের দুষ্কর্মের উল্লেখ আছে এবং প্রাক্তনের গতির কথাও বলা হয়েছে: কিন্তু এগুলো প্রবচন রূপে এসেছে মাত্র—গভীর বেদনা, অপরিসীম হতাশ্বাস অথবা ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় এর মধ্যে নেই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেবতাদের পারস্পরিক সংযোগ ধারায় একটি অসাধারণ ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস ঘটেছে এবং মহাদেবের সমর্থনের পর কার্যক্ষেত্রে সেই ষড়যন্ত্রের প্রকাশ ঘটলো। এখানে ভাগ্য কোথায়? যেহেতু রাবণ এই ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস সম্বন্ধে অবহিত নয়, তাই তার চিন্তায় ভাগ্যগত অনুভূতির কথা পাই এবং এভাবেই ভাগ্যের এক বিরাট পরিহাসে রাবণ নিঃশেষ হলো। সুতরাং একমাত্র রাবণ চরিত্রকে অর্থাৎ এই চরিত্রের চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রবাহকে অনুসরণ করলেই আমরা ভাগ্যের অমোঘ এবং নিঃসংশয় রূপের পরিচয় পাই। রাবণের বিভিন্ন উক্তিতে এই সত্যটি ধরা পড়েঃ

১. কুসুমদামে সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;

নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?
[প্রথম সর্গ]

২. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদল পতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বু স্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
[প্রথম সর্গ]

৩. এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষীজনে কে নিন্দে, সুন্দরি !
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

[প্রথম সর্গ]

৪. বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্বুরের গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর।

[নবম সর্গ]

৫. ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি,—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?

[নবম সর্গ]

রাবণের এ সমস্ত উক্তি সাধারণ সংবাদবহ নয়, এগুলো তার হৃদয়-বেদনা এবং উপলব্ধির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। পরাজয়ের অপ্রতিরোধ্য গতি দেখে সে অনুভব করছে যে ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। কয়েকটি ঘটনায় তার এই অনুভূতিটা প্রবল হয়েছে—প্রথম, অনবরত শত্রুপক্ষের হাতে দেশের সৌন্দর্য ও শক্তির ক্রমবিপর্যয়; দ্বিতীয়, রাম কর্তৃক সেতুবন্ধন. যে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা রাবণের কল্পনায় কখনো জাগেনি; তৃতীয়, যে লক্ষ্মণকে সে নিহত বলে ধারণা করেছিল, তার জীবনপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ. তার জীবনের একমাত্র আশা মেঘনাদকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে মৃত্যু—সেই আশাভঙ্গের কারণে তুলনাহীন বেদনা। এই কয়টি বেদনাময় আকস্মিকতায় ভাগ্যের অমোঘ রূপের যে পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে তার তুলনা যে-কোন সাহিত্যে বিরল। নিয়তির এই অনিবার্যতার সঙ্গে দেবতাদের সক্রিয় বিরুদ্ধতা সম্পর্কে রাবণের অজ্ঞানতাকে যখন আমরা মিলিয়ে দেখি তখন নিয়তির পরিহাসটা বড় বেশী নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পায়: কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একমাত্র এই নিষ্ঠুরতার কারণেই রাবণ আমাদের হৃদয়ের এত নিকটে।

টীকা

১. "There are Three conjoined Fates, robed in white, whom Erebus begot on Night ; by oame Cloths, Lachesis, and Atropos···Zeus, who weighs the lives of men and informs the Fates of his decisions can, it is said, change his mind and intervene to save whom he pleases, when the thread of life, spun on Clotho's spindle, and measured by the rod of Lachesis, is about to be snipped by Atropo's spears."—The Greek Myths: Robert Graves. ১০ম অধ্যায়ে আলোচিত। ১৯৫৫ সালে Penguin কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটি আমার অবলম্বন ছিলো।

২. (ক "Nemesis is a personification of the moral reverence for law, of the natural fear of committing a culpable action, and hence of conscience, and for this reason she is mentioned along with 'Aidos'. In later writers, as Herodotus and Pindar, Nemesis is a kind of fatal divinity, for she directs human affairs in such a manner as to restore the right proportions or equilibrium wherever it has been disturbed ; she measures out happiness and unhappiness, and he who is blessed with too many or too frequent gifts of fortune, is visited by

her with losses and sufferings, in order that he may become humble, and feel that there are bounds beyond which human happiness cannot proceed with safety."—Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Edited by William Smith, London ; Toylor, Walton and Maberly 1844.

খ) A Companion to Homer, Edited by Alan J. B. Wace and Frank H. Stubbings. (London, Macmillan & Co. Ltd, 1963) গ্রন্থের Social Culture নামক অধ্যায়ে 'নেমেসিস' এবং 'আইদস' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

৩. Virgil : The Aeneid, a new translation by W. F. Jackson Knight : The Penguin Classics. 1956—ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ভার্জিলের জন্ম হয় ইতালীর উত্তরাঞ্চলে মানতুয়া শহরে খৃষ্টপূর্ব ৭০ সালে এবং মৃত্যু হয় খৃষ্টপূর্ব ১৯ সালে। 'ইনিদ' তাঁর সর্বশেষ এবং বৃহত্তম ও মহোত্তম কাব্য। এ কাব্যে রোমক জাতির একটি কাল্পনিক উদ্ভবের কাহিনী বর্ণিত আছে।

৪. ভার্জিলের কাব্যে—ইনিস প্রেমের দেবী ভিনাসের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন মানুষ। ভিনাস সকল দুর্যোগে ইনিসকে রক্ষা করেছেন। অন্যপক্ষে দেবতাদের রাণী জুনো ইনিসের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু রোমক জাতির প্রতিষ্ঠাতা হবেন বলে ইনিস ছিলেন নিয়তি নির্দিষ্ট পুরুষ, তাই জুনোর স্বামী জুপিটার ভেসটিনি বা ভাগ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইনিসকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। 'ইনিদ' কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি যে নিয়তির একটি পূর্ব-নির্ধারিত এবং সুপরিকল্পিত রূপ আছে।

৫. Sophocles : King Oedipus : E. F. Walting কৃত ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য। The Penguin Classics-এ প্রকাশিত, ১৯৫১।

৬. সেকস্পীয়রের ট্রাজেডিতে আমরা লক্ষ্য করি যে নায়কের আচরণ তার অন্তর্নিহিত সত্তার স্বভাব থেকে উদ্ভূত। ইলিয়টের ভাষায়—

'integral with the human nature of his characters'. (Shakespeare and the stoicism of Seneca)।

৭. প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণের আক্ষেপ। চরণ ৮৪—১০৩।

৮. রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদা প্রাসাদ-অভ্যন্তর থেকে সভাকক্ষে প্রবেশ করে আপন চিত্তের বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করছেন। চরণ : ৩৯০—৪০৫।

৯. জলতলে বিক্ষুব্ধা বারুণীর নির্দেশে তার সখী মুরলা কমলালয়ে যেয়ে দেবী রমাকে রাবণের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রথমে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেঘনাদকে প্রমোদ উদ্যান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে আনতে হবে। চরণ : ৬১০—৬১২।

১০. মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ : চরণ : ৪১০—৪১৬।

১১. হোমারের 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' কাব্যে মানুষের পৃথিবীর চতুর্দিকে অপ্রাকৃত দেবলোকের অবস্থিতি। দেবলোকের অধিবাসীবৃন্দ, অর্থাৎ দেবতাগণ মরণশীল পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল প্রকার কর্মধারায় প্রভাব বিস্তার করেন। দেবতাবৃন্দ পৃথিবীর পরম শাসক। মানব ভাগ্যের নির্মাতা এবং নিয়ন্তা, আদর্শ ও নীতিবোধকে তাঁরা রক্ষা করেন। আবার কখনও কখনও তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তির অথবা মানুষের আবেগ, চিন্তা ও স্বপ্নের প্রতীকরূপে উপস্থিত হন যাকে ব্যক্তুৎপ্রেক্ষণ বা পারসনিফিকেশন বলা চলে।

হোমারের দেবকুলের মধ্যে সর্বশক্তিমান হচ্ছেন 'জিউস'। তিনি ক্রোনেস এবং রিয়ার পুত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুজন ভ্রাতা হচ্ছেন 'পসিডন' এবং 'হেডিস্'। এঁরা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন, তখন স্বর্গের অধিকার পেলেন জিউস। সমুদ্র এবং জলতলের অধিকার পেলেন পসিডন এবং অন্ধকার পাতাল বা মৃতের রাজ্যের অধিকার পেলেন 'হেডিস্'। কিন্তু পৃথিবীর উপর সকলের অধিকার সমভাবে রইলো। হোমার জিউসকে অলিম্পাস পর্বতের শিখরদেশে অবস্থানরত বলে কল্পনা করেছেন, যে শিখর স্বর্গ ভেদ করে

দূরলোকে চলে গিয়েছে। আগ্রহী পাঠক ২-সংখ্যক টীকায় উক্ত : 'A Dictionary of Greek and Roman Biography দেখতে' পারেন। Robert Graves রচিত 'The Greek Mythis' (Pengiun Books) গ্রন্থেও গ্রীক দেবকুলের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে।

১২. Homer : The Iliad—Translated by E. V. Rieu : The Penguin Classics.

১৩. মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ : চরণ ৫১—৫২।

১৪. ঐ : চরণ ৭০—৮৪।

১৫. ঐ : পঞ্চম সর্গ : চরণ ৪৬৮—৪৭০।

১৬. ঐ : চরণ ৪৭৯—৪৮৯।

১৭. ঐ : তৃতীয় সর্গ : চরণ ৪৩৫—৪৪০।

১৮. ঐ : চরণ ৪৫২—৪৫৬।

১৯. ঐ : দ্বিতীয় সর্গ : চরণ ৪২৬—৪৩৮।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ-চরিত্রের পূর্ণতা

মহাকাব্যে চরিত্রের পূর্ণতা চরিত্রের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং ইতিহাসগত পরিণতির উপর নির্ভর করে না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে[১] এই ইতিহাস পুরাণগত পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তাই সেখানে নায়কের বংশ-পরিচয়, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ক্রমবিকাশ এবং ইতিহাস-পুরাণাশ্রিত পরিণতি লক্ষ্য করি। গ্রীক আলঙ্কারিকরা[২] চরিত্রের পূর্ণতার ইতিহাস এ ভাবে জ্ঞাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তারা বলেছেন যে চরিত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ আবেগ বা সত্যবোধে পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়। এই জাগরণের মধ্যেই চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয়। জীবনের দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে মানুষের যে বিকাশ তাতে মানুষের দৃশ্যমান গতিবেগের পরিচয় আছে; কিন্তু প্রাণ-প্রবাহের যথার্থ পরিচয় আছে কিনা বলা কঠিন, কেননা প্রাণধর্ম দেহবিকাশের সঙ্গে পূর্ণভাবে জড়িত নয় এবং মানুষ যে ক্রমান্বয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবর্ধমানরূপে অগ্রসর হয়েছে তাতে গতানুগতিকতার স্বরূপই আছে; কিন্তু হৃদয় বিকাশের পরিচয় নেই। গ্রীক আলঙ্কারিক গুরুত্ব দিয়েছেন ঐক্যতত্ত্বের উপর—সময়, স্থান এবং আবেগের সম্মিলিত ঐক্যতত্ত্ব। সেখানে সময় স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং স্থান ও সময়ের সঙ্গে জড়িত হয়েই আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। তাই সেখানে আমরা দৃশ্যমান গতানুগতিক জীবনধারার প্রবাহ পাই না; কিন্তু হঠাৎ এক বিশেষ মুহূর্তে সম্পূর্ণ জীবনকে বিশেষ আবেগের সম্ভারে জাগ্রত এবং বিকাশমান দেখি। যুদ্ধক্লান্ত ওদিসিউস[৩] জীবনের মধ্যযামে বহু বিপদ এবং অসম্ভাবের সম্মুখীন

হলো, অবশেষে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে গৃহের মমতা এবং সমর্থনের ক্ষেত্রে নিজেকে আবিষ্কার করলো। এ আবিষ্কারের মধ্যেই আমরা ওদিসিয়াসের পূর্ণ পরিচয় পেলাম। ওদিসিয়াসের পূর্ণতা হচ্ছে তার জাগ্রত জীবন এবং শক্তিমান মানসিকতা। সংস্কৃত কবি সর্বমুহূর্তেই আকস্মিকভাবে চরিত্রের পূর্ণ ইতিহাস জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, তাই রামায়ণে রামের জন্ম, ক্রমবর্ধমান অবস্থা, বিবাহ, বিপর্যয়, অসদ্ভাব এবং অবশেষে শান্তি ও মৃত্যুর পরিচয় আছে; অর্থাৎ সংস্কৃত কবি জীবনের দৃশ্যমান বিকাশকে অস্বীকার করেননি। গ্রীক কবি যেখানে উপলব্ধির উপর জোর দিয়েছেন, সংস্কৃত কবি সেখানে ইতিহাস বা পুরাণ-আশ্রিত পরিচয়ের উপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য জীবনের দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার অর্থ এই রস বিশ্লিষ্ট হয়েছে চরিত্রের ইতিহাস থেকে এবং রস সে কারণে চরিত্রের উপর আরোপিত। সময়ের দীর্ঘ পরিসরে চরিত্র বিভিন্ন রসের বিকাশ ঘটিয়েছে আপন জীবনে, তার মধ্যে একটি রস প্রধান, অন্যগুলো হচ্ছে তার অনুষঙ্গী। তাই সেখানে রস-বিশ্লেষণ চরিত্র থেকে বিলক্ষণ। গ্রীক কাব্যে এটা সম্ভবপর হয়নি। তার কারণ সেখানে চরিত্র আবেগের সম্ভার, সময় এবং স্থান নিয়ে একই সঙ্গে উচ্চকিত। ওডিসিকাসের শক্তিমান রূপ অথবা ব্যক্তিত্ব তার গতিবিধির সঙ্গে জড়িত; কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্র সেভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয় না। জীবনের বিস্তৃত বিকাশ নিয়ে রামচন্দ্র বিভিন্ন সময় আপন জীবনে বিভিন্ন রসের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সেই সব রস বিশ্লেষণের জন্যে বিভিন্ন ঘটনাই যথেষ্ট। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ আবেগ প্রকাশের জন্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উন্মোচন প্রয়োজন হয়েছে। আবেগের ব্যাখ্যার জন্যে ঘটনা এসেছে, তাই সেখানে চরিত্রের একটি স্থূলরূপ খুঁজে পাওয়া যায়।

আরোপিত-সত্য এবং উদ্ভূত সত্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উদ্ভূত সত্যের ক্ষেত্রে ঘটনা, আবেগ এবং চরিত্র একই সঙ্গে জাগ্রত। ঘটনাকে সেখানে আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং চরিত্র ঘটনা এবং আবেগের মধ্যেই জাগ্রত। আরোপিত-সত্যে আমরা পূর্ব থেকে নির্ধারিত

চরিত্রকে পাই; অর্থাৎ কবি সেখানে চরিত্রের ঘটনাগত একটা বিন্যাস নির্মাণ করেন এবং সেই বিন্যাসের মধ্যে বিভিন্ন আচরণের পরিচয় দেন। যেমন রামচন্দ্র লোকরঞ্জক প্রজাহিতৈষী, ধর্মপ্রাণ—চরিত্রের এহেন প্রস্তাবনা গ্রন্থারম্ভেই করা হয়েছে। কবির দায়িত্ব হচ্ছে এরপর বিভিন্ন কৃত্যে এই আদর্শগুলোর পরিচয় দেওয়া। গ্রীক কবি এখানে চরিত্রের কোন প্রস্তাবনা করবেন না, চরিত্র সেখানে উদিত হবে নতুন সূর্যের মত, যেমন হয়েছে ইউলিসিসের ক্ষেত্রে অথবা ইডিপাস নাটকে ইডিপাসের ক্ষেত্রে। লেখক চরিত্রকে নির্ধারিত করে দেননি, চরিত্র আপনার হৃদয়ের সত্যে আপনাকে নির্মাণ করেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা চরিত্রের এ পূর্ণতাকে কি ভাবে পাই? তিনি কি আরম্ভে চরিত্রের প্রস্তাবনা করেছেন? না তাঁর চরিত্রগুলো বিচিত্র বিপর্যয়ে আপনাদেরে নির্মাণ করেছে? রাবণ-চরিত্রের উন্মোচন এবং সমৃদ্ধি দেখলেই সহজে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যায়। এ কাব্যে রাবণ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ চরিত্র এবং আবেগের সম্পূর্ণতার জন্যে চরিত্র এখানে পূর্ণাবয়ব। রাবণ-চরিত্রের উন্মোচন যখন তখনই তার বিকাশ এবং সমৃদ্ধি; কোন প্রকার সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন হয়নি। বিচিত্র কৃত্যে আপনাকে বিকাশমান করবারও প্রয়োজন হয় না। সময়, আবেগ এবং চরিত্র একটি ঐকতান গড়েছে। আমরা রাবণকে পাই রামায়ণের ইতিহাসের ধারায় কোন বিশেষ পর্যায়ে নয়: কিন্তু তাকে পাই একটি চরম সঙ্কটের মুহূর্তে নিঃসংশয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যে বিপর্যয়ের প্রতিরোধ অসম্ভব, সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েই সে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে অত্যন্ত সচেতন।

প্রথম সর্গেই রাবণ চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত দেখি। দৃশ্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে রাবণকে স্নেহে আর্ত এবং বেদনায় ভয়প্রাণ দেখি এবং এই আর্ত ও ভয়প্রাণ অবস্থায় রাবণের সম্পূর্ণ জীবন যেন নিঃশেষিত মনে হয়। সে নিজেকে ভাগ্যাহত মনে করেছে। কেন তার সর্বনাশ ঘটলো তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে আপন প্রবৃত্তির উপর দোষারোপ করছে; কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখি যে বীরবাহুর বীরত্বখ্যাতি শুনে

রাবণ আনন্দিত হচ্ছে এবং সবাইকে আবার নতুন করে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে বলছে। এর পরেই রাবণের আবেগ হচ্ছে দেশের সম্মান এবং সৌন্দর্য রক্ষা করা। দেশ-প্রীতির এই দীপ্তিময় ব্যঞ্জনা নিম্নের দুটি উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হবে :

১ এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলী ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ : জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।*

২ নয়নে তব, হে রাক্ষস পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরী,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি !
রক্ষঃকুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী।*

আমরা লক্ষ্য করছি যে পূর্বাহ্নে প্রস্তাবিত কোন বিশেষ রূপে রাবণ-চরিত্রের বিকাশ ঘটেনি ! চরিত্র নিজের পথ নিজেই নির্মাণ করেছে। কবির কোন দায়িত্বই যেন নেই ! চরিত্র বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ক্রমান্বয়ে আপন প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করেছে। এ ভাবে যে চরিত্র নির্মিত হলো তার মধ্যে আমরা আরোপিত-সত্যকে পেলাম না, কিন্তু উদ্ভূত-সত্যকে পেলাম। অর্থাৎ সত্য এখানে চরিত্রের বিকাশের মধ্যে ফলবান ; কিন্তু সত্য সমর্থনের জন্যে চরিত্রের বিকাশ নয়। সত্য বলতে আমরা এখানে চরিত্রের প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতাকে মনে করছি।

সংস্কৃত কাব্যে কবিরা চরিত্রের প্রস্তাবনা শুরুতেই করেছেন, তার কারণ চরিত্র সেখানে প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে নেওয়া এবং সে কারণে চরিত্রের সচলতারও একটা বাধ্যবাধকতা আছে, অর্থাৎ চরিত্র পুরাণে এবং ইতিহাসে যেভাবে নির্মিত হয়েছে তার থেকে কোন প্রকারের ব্যতিক্রম ঘটছে না। কালিদাস রঘুবংশের শুরুতে বলছেন যে সূর্য-সম্ভূত বংশের বর্ণনা অতিশয় দুষ্কর হলেও এ বিষয়ে এক উপায় বিগুমান আছে; মহাকবি বাল্মীকি ও অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ এর প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করে গেছেন। হীরক দ্বারা ছিদ্র করলে মণির মধ্যে যেমন সহজেই সূত্রের সঞ্চার হয়ে থাকে, বর্ণনীয় অংশে কালিদাসেরও সেইরূপ গতি হবে।[৬] অর্থাৎ প্রাচীন মহর্ষিগণের বিরচিত আখ্যানসমূহই তাঁর প্রধান সহায় হবে। আমরা তাই দেখতে পারি যে প্রাচীন মহাকাব্যে চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না, প্রাচীন নির্ধারিত সত্যের সমর্থনই ছিল সেখানে বড় কথা! মধুসূদনের প্রার্থনা ভিন্ন ধর্মী। প্রথম সর্গে তিনি বলছেন ঃ

গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।[৭]

চতুর্থ সর্গে কবির প্রার্থনা ঃ

হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব

দীন আমি! রত্নরাজী তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।[৮]

দেখা যাচ্ছে কবি নির্ধারিত কোন চরিত্রকে অনুসরণ করছেন না। পূর্ববর্তী কবিগণের আবেগ তিনি চান, কিন্তু তাঁদের অবলম্বিত সত্যকে তিনি চান না। জীবনের উন্মোচন এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি নতুন প্রাণসম্পদ যাচ্ঞা করেছেন এবং এক্ষেত্রে মধুসূদনের সম্পর্ক গ্রীক কবিদের সঙ্গে। তাঁদের প্রাণধর্মকে তিনি অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদের ঐকান্তিক্ তাঁর স্বপ্নে ও কল্পনায় নতুন অনুভূতির সঞ্চার করেছে।

যেখানে সংস্কৃত কবি ভক্তি এবং নিবেদনের পথ বেছে নিয়েছেন,[৯] প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য কবি সেখানে কাহিনীর উন্মোচন এবং বিন্যাস চেয়েছেন মাত্র। কাহিনীর উন্মোচন অর্থাৎ চরিত্রের মূল সত্য এবং কাহিনীর সঙ্কটকালের জাগরণ। ইনিদের শুরুতে[১০] ভার্জিল নায়কের অশেষবিধ বিপর্যয়, সর্বনাশ এবং সঙ্কটের কারণ সন্ধান করেছেন, দান্তে 'ডিভাইন কমেডি'র শুরুতে মিউজের সহায়তা চেয়েছেন সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে[১১]; কিন্তু সত্য যে কি তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি, কাহিনীর উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সত্য আপনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য 'প্যারাডাইজ লষ্ট' এ মিল্টন সংস্কৃত কবিদের মত আরোপিত সত্যের কথা বলেছেন।[১২] সেখানে ন্যায়ানুসরণ এবং খ্রীষ্টান সমর্থিত সত্যের প্রতিষ্ঠাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্র উনিশ শতকের নবজাগ্রত জীবন চেতনার প্রতীক। উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ যখন সর্বতোভাবে স্বাধীন হতে চাচ্ছে সে মুহূর্তেই মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের আবির্ভাব। সর্বতোভাবে স্বাধীন অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত, ধর্মপ্রেরণায় সর্বমুহূর্তেই উচ্চকিত। যুগের এই স্পৃহাকে রাবণ বহন করছে, তাই তার জীবনে জয়-পরাজয়ের বৈলক্ষণ্য নেই, কেননা সংগ্রামই যেখানে সত্য সেখানে শান্তিও সংগ্রামের সঙ্গেই ওতঃপ্রোত। অস্তিত্বের মূল্য বিপর্যয়ের বিস্তারের মধ্যেই,— কোনপ্রকার জয়লাভের মধ্যে নয়। মেঘনাদবধ কাব্যে তাই আমরা কোন প্রকার জয় কিংবা পরাজয়ের ইতিহাস পাই না; কিন্তু সংঘর্ষের অভিঘাতে

জীবনের মূল্য নিরূপিত হতে দেখি। 'কিং লিয়ার' নাটকে সেক্সপীয়ার যে কথা বলেছেন, 'Men must endure their going hence, even as their coming hither ; ripeness is all.'[১৩] মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রয়োগ করা চলে। অপরিসীম তমসায় সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়নি, কিন্তু তমসা আছে বলেই নতুন সূর্যের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে অপরিসীম তমসার মধ্যে দেবতাদের জয় ঘোষিত হয়েছে ; কিন্তু রাবণের সত্যিকার বিকাশ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় সর্গে দেবতাদের কার্যক্রম যেখানে বর্ণিত হয়েছে তখন রাত্রিকাল—

অস্ত গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি—
একটি রতন ভালে।[১৪]

পঞ্চম সর্গে যেখানে দেবতাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হচ্ছে তখনো অপরিসীম অন্ধকার—

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ আলয়ে[৫]

ষষ্ঠ সর্গে যেখানে রাবণকুলের সর্বনাশ হল, দেবতাদের এবং দেবোপম মানুষের অমানুষিকতায় সেখানে অন্ধকার রাত শেষ হয়নি।

অষ্টম সর্গে যেখানে রাম পাতালপুরীতে দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে লক্ষ্মণকে বাঁচাবার প্রার্থনা নিয়ে, তখনো অন্ধকার রাত—

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট, রাখিল খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব।[১৬]

কিন্তু রাবণের জাগরণ পরিপূর্ণ সূর্যালোকে। মেঘনাদের হত্যার পর সপ্তম সর্গে যেখানে রাবণ যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করছে তখন রাত্রি নেই—

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,

চাহিলা মহীর পানে ! উল্লাসে হাসিলা

কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে ।[১১]

এবং নবম সর্গে যেখানে রাবণকে সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেখছি, কিন্তু শক্তিহীন অবস্থায় নয়, তখনো প্রমুক্ত উষা—'প্রভাতিল বিভাবরী'। মনে হয় কবি সূর্যালোক এবং তমসার বৈপরীত্যের মাধ্যমে জীবনের মূল্য নির্ধারিত করেছেন।

মহাকাব্যে অন্ধকার সাধারণত গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতীক—কখনো কখনো পরাজয়ের, হতাশ্বাসের, লাঞ্ছনার এবং গ্লানিকর জীবনযাত্রার. আবার কখনো কখনো অন্যায় আচরণের, নিষ্ঠুরতার এবং মলিন ও অসমর্থিত সম্পর্কের। এংলো সেক্সন মহাকাব্য 'বিউলফ' এ আমরা সমস্ত ঘটনা গভীর অন্ধকারের মধ্যে সংঘটিত হতে দেখি। সমস্ত লোক দিবসের অপরিমিত আনন্দের রাত্রিতে যখন উন্মুক্ত প্রাসাদকক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছে. তখন সমুদ্রের তলদেশ থেকে একটি নিষ্ঠুর দৈত্য বেরিয়ে আসছে আর নিরীহ নাগরিকদের আক্রমণ করছে। এ দৈত্যের জয় অন্ধকারের মধ্যেই। বিউলফ মহাকাব্যে আমরা মানুষের অন্ধকার থেকে আলোকে বিনির্গমনের সাধনার পরিচয় পাই এবং সেখানে সর্বপ্রকার অননুষ্ঠেয় কর্ম রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে দৈত্যকে হত্যা করার পর অবশেষে বিউলফ বেরিয়ে এল পরিপূর্ণ আলোকে অর্থাৎ তখন সর্বপ্রকার অসদাচরণের সমাপ্তি ঘটল এবং মানুষ আপন বিশ্বাস এবং শক্তিকে অবলম্বন করে জাগ্রত হল।

অন্ধকারকে পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন কীট্‌স্‌ তাঁর 'হাইপেরিয়ান' গ্রন্থে। সেখানে শনি দেবতার পরাজয়ে অস্তিত্ব বিচ্যুতির যে সংবাদ আছে, তার পরিচয় এভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন,—

Deep in the shady sadness of a vale
Far sunken from the healthy breath of morn
Far from the fiery noon, and eve's one star ;
Sat grey-hair'd Saturn quiet as a stone,
Still as the silence round about his lair ;
Forest on forest hung about his head

Like cloud on cloud. No stir of air was there,
Not so much life as on a summer's day
Robs not one light seed from the feather'd grass,
But where the dead leaf fell, there did it rest.
A stream went voiceless by, still deadened more
By reason of his fallen divinity
Spreading a shade : the Naiad 'mid her reeds
Press'd her cold finger closer to her lips.[১৮]

এ কাব্যে কীট্‌স্‌ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যে আমাদের পদচারণের সঙ্গে সঙ্গে জয়ের আশ্বাস আসে এবং আমরা এই জয়ের সম্ভাবনায় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসি। রূপহীন অসম্ভাব এবং বিশৃঙ্খলা অন্ধকারেই শক্তিমান; কিন্তু আমরা জয়লাভের পথে যতই অগ্রসর হই, ততই সর্বপ্রকার shapeless chaos কে অতিক্রম করে আসি। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে আলোককে জয়, আশ্বাস এবং সম্ভাবনার প্রতীক ধরেছেন অসম্ভাবের এবং অন্যায়ের এবং অন্ধকারকে প্রতীক ধরেছেন বিশৃঙ্খলার।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করে রাবণ যখন যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন তখন তিনি বলছেন যে মেঘনাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ইষ্টদেবকে পূজা করা এবং পরে প্রভাতকালে রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ করা। রাত্রিকালে কোন প্রকার কার্যক্রম তিনি সমর্থন করেননি—

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিণু তোমারে।
দেখ অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।[১৯]

দ্বিতীয় সর্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, যখন রাত্রি হল তখন দেবতাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হল। অন্ধকার রাত্রিতে দেবতারা রাবণের বিনাশের পরিকল্পনা

গ্রহণ করলেন। এক পক্ষ যখন সংগ্রামের প্রয়োজনে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় আছে, অপর পক্ষ তখন অন্ধকার রাত্রিতে গোপন অসদাচরণের সুযোগ নিয়েছে।

তৃতীয় সর্গে কবি প্রমীলার আসন্ন সর্বনাশের আভাস সূর্য ও অন্ধকারের রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন,—

আচল ভরিয়া ফুল তুলিল দু'জনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
'তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা কালে,
ভানু প্রিয়ে, আমি ওলো সহি সে যাতনা!
আধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদ
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?'[১০]

তৃতীয় সর্গের একটা ব্যাপার এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। তা হচ্ছে এই যে, প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় তার নারী-সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরে যাচ্ছে গভীর রাত্রিবেলায়; কিন্তু সেখানেও কোন গোপনতা নেই। বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল স্পষ্টতায় প্রমীলা তার সখীদের নিয়ে রামের শিবিরের সামনে এসেছে এবং অগ্রসর হবার দাবি জানিয়েছে,—

বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী

স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজবলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্র বাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ পালে।[২১]

প্রমীলা যে হঠাৎ রঘুপতির সামনে এসে তাদের বিভ্রান্ত করেছে তা নয়, প্রথম থেকেই সে স্পষ্টভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং সবাইকে জানিয়েই পথ চলেছে, গোপনে নয়,—

যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি;
ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নি-শিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।[২২]

প্রথম সর্গে যেমন দেখেছি রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করছে এবং প্রকাশ্য-যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে বলছে, তেমনি এখানে প্রমীলার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার অন্তরালের এবং গোপন আচরণের প্রশ্রয় নেই। অপ্রস্তুত রাম-সৈন্যকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পরাভূত করা প্রমীলার পক্ষে অসম্ভব ছিল না; কিন্তু প্রমীলাও রাবণ এবং মেঘনাদের মত বীরধর্মে বিশ্বাসী। তাই কোন প্রকার অসদাচরণের সমর্থন তার মধ্যে আমরা পাই না। প্রমীলা বলছে যে রাম মেঘনাদের শত্রু এবং মেঘনাদ বীর, সুতরাং মেঘনাদ সংগ্রামে

তাঁকে পরাভূত করবে। রামচন্দ্র প্রমীলার শত্রু নয়, তাই প্রতি-বৈরীর সঙ্গে সংগ্রাম করবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর নেই, তবে আঘাত করলে প্রতিঘাতের জন্যে সে প্রস্তুত হবে,—

রঘুবর পতি-বৈরী মম
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবনবিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রসে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।[১৩]

এই সর্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাবণ পক্ষীয়দের কর্মধারাও কখনো কখনো রাত্রিতে সংঘটিত হয় ; কিন্তু সেখানে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে না এবং কোন প্রকার গোপনতার প্রশ্রয় থাকে না। রাত্রিও সেখানে দিনের স্বচ্ছতা পায়। এক ক্ষেত্রে সূর্যালোকে সমস্ত কিছু উজ্জ্বল, অন্যক্ষেত্রে অগ্নি-শিখায় সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত। এই সর্গে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনবরত অগ্নির উপমা এনেছেন, যেমন—

১ চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে।[১৪]

২ যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশদিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভাবাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ পুঞ্জে।[১৫]

৩ অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে![১৬]

৪ যথা অগ্নি শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিক আইলা ধাইয়া
পৌরজন![২৭]

৫ চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।[২৮]

সপ্তম সর্গে রাবণ যেখানে শুধু বীরধর্মের উপর নির্ভর করে উজ্জ্বল দিবালোকে প্রকাশ্য সংগ্রামে নেমেছে, সেখানেও রাম-পক্ষীয়েরা ছলনা এবং গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় ছাড়েনি। রাবণের পরিচয় এ সর্গে যতটা পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়েছে, অন্য কোথাও ততটা হয়নি। সর্বস্বহারা হয়ে রাবণ চরম সঙ্কটের মুহূর্তে একমাত্র মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত। এখানে মৃত্যুতে তার পরাজয় নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। রাবণের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ—অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী,—আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণ লঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্র সম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতি সম? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে

বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারি-ধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী, স্মরি তারে চল রণস্থলে !
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্বুরকুলে—
কর্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী ![১৯]

এর পূর্বের অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গে অন্ধকারে গোপন অন্যায়ের চরম নিদর্শন আমরা দেখেছি। সর্বপ্রকার ন্যায়, সদ্ভাব, সম্ভ্রম, ক্ষত্রধর্ম বা সজীব বীরধর্মের স্পর্ধা সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে লক্ষ্মণ নির্লজ্জ-তস্করের মত দেবতাদের সহায়তায় কৌশলে মেঘনাদকে হত্যা করছে। লক্ষ্মণ এসেছে মায়াদেবীর সহায়তায় সকলের অলক্ষ্যে অত্যন্ত গোপনে। কাপুরুষতার এমন জঘন্য নিদর্শন আর কোথাও নেই। অন্য দিকে আমরা দেখি যে, মেঘনাদ প্রকাশ্য যুদ্ধে লক্ষ্মণের সম্মুখীন হবার পূর্বে ইষ্টদেবকে অর্চনা করছে। এ অর্চনা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্যে, লক্ষ্মণকে নিহত করার গোপন কৌশলের সন্ধানের জন্যে নয় এবং মনে রাখতে হবে ইষ্টদেবের পূজাও গোপন থাকেনি। বিভীষণের পথ নির্দেশে লক্ষ্মণ সেই অর্চনাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে এবং গোপন আক্রমণে শুধু যে মেঘনাদকে হত্যা করেছে তা নয়, সত্য, পবিত্রতা এবং মনুষ্যধর্মকেও হত্যা করেছে। লক্ষ্মণের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে ঃ

আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে![৩০]

এর সুন্দর উত্তর দিয়েছে মেঘনাদ নিজেই:

ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ। নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি
পশিলি এ গৃহে তুই।[৩১]

অন্যায় সমরে চরমভাবে আহত হল যখন মেঘনাদ তখনকার বর্ণনায় মধুসূদন অপরিসীম করুণা প্রকাশ করেছেন:

যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায় অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুর-বিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু যবে শ্যামমণি
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।[৩২]

মেঘনাদের হত্যার পর লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ যখন ফিরে চললো রামের কাছে তখন তারা স্পষ্ট পথে সমুন্নত শিরে যায়নি। যেভাবে গোপন

পদচারণ ছিল তাদের প্রথম যাত্রায় সেই একই গোপনতা নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শঙ্কাকুল চিত্তে তারা পলায়ন করলো :—

বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শাদূ‌র্লী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।[৩৩]

অপরিসীম তমসার চিত্র এঁকেছেন মধুসূদন অষ্টম সর্গে, যেখানে রামচন্দ্র পাতালে গিয়েছেন পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে। সর্গের আরম্ভেই আমরা রাত্রি দেখি। এই রাত্রিতেই বৈতরণী পার হয়ে চির নিশারত-পুরীতে রামচন্দ্র আসছেন। এখানকার অন্ধকার অতলস্পর্শী, ভয়াবহ এবং যন্ত্রণায় নিঃসংশয়। মধুসূদন এই সর্গের আদর্শ পেয়েছিলেন ভার্জিলের ইনিদ মহাকাব্যের ষষ্ঠ পুস্তকে! ইনিদে অন্ধকারের বর্ণনা এভাবে আছে :

They were walking in the darkness, with the shadows round them and night's loneliness above them, through Pluto's substanceless Empire, and past its homes where there is no life within ; as men walk through a wood under a fitful moon's ungenerous light when Jupiter has hidden the sky in shade and a black night has stolen the colour from the world. In front of the very Entrance Hall, in the very Jaws of Hades, Grief and Resentful Cave have laid their beds. Shapes terrible of aspect have their dwelling there, pallid Diseases, Old Age forlorn, Fear, Hunger, the Counseller of Evil, ugly Poverty, Death and Pain. Next is the Sleep who is close kin to Death, and Joy of Sinning and, by the threshold in front, Death's harbinger, War. And the iron chambers of the Furies are there, and Strife the insane, with a bloody ribbon binding her snaky hair.[৩৪]

মধুসূদন অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত !
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী—
বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !

নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশ দেশে ;—
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ; ঘণ ঘণাবলী,—
উগারি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্য পথে
বাতগর্ভ, গর্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইতু বসাইয়া রোষে।[৩৫]

মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেক বেশী পড়েছে এবং প্রভাবটি মূলত স্থূল। কাব্যভাবের দিক থেকেও এ সর্গটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল। এখানে গতির পরিচয় নেই, প্রাণ-ধর্মের পরিচয় নেই, একটি আড়ষ্ট অচেতন কল্পনাকে মধুসূদন কোনক্রমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিদেশী-সাহিত্যের মূল অনুকৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১ এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ ভোগে ;
হে প্রবেশি, ত্যাজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে ![৩৬]

দান্তের ডিভাইন কমেডিতে পাই ঃ

"Through me the road to the city of desolation,
Through me the road to sorrows diuturnal,
Through me the road among the lost creation,
... ...
Nothing ere I was made was made to be
Save things eterne, and I eterne abide ;
Lay down all hope, you that go in by me."[৩৭]

২ বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে।[৩৮]

ওদিসির একাদশ পুস্তকে আছে:

"Vultures, hunched above him, left and right
rifling his belly, stabbed into the liver,
and he could never push them off."[৩৯]

৩ নহে ভূতপূর্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়ামাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে এ শরীর মম।[৪০]

ওদিসির একাদশ পুস্তকে পাই ওদিসিউসের মাতা বলছেন:

"No flesh and bone are here, none bound by sinew,
Since the bright-hearted pyre consumed them down—
the white bones long exanimate—to ash;
dreamlike the soul flies, insubstantial."[৪১]

মায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার নরকের দেশে রামচন্দ্রের যাত্রা এপোলোর প্রিস্‌টেসের সঙ্গে ইনিদের যাত্রার সঙ্গে তুলনীয়। ইনিদ এসেছে এক ভয়াবহ নদীর তীরে যেখানে বহু আত্মা জড়ো হয়েছে নদী পার হবার আশায়। বসন্তের শুরুতে ঝরে পড়া অজস্র শুকনো পাতার মতো তাদের সংখ্যা অনেক। নদী পার হয়ে তারা যেতে চাচ্ছে সূর্যকরোজ্জ্বল ভূমিতে, তারা আশায় তাদের বাহু প্রসারিত করেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর নৌকাচালক তাদের কাউকে পার করছে, আবার কাউকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ইনিদ প্রশ্ন করলো, নদীর তীরে এ জটলার কারণ কি? এ সমস্ত আত্মারা কি চায়? দেবী উত্তর করলেন:

All this multitude which you see are the resourceless who had no burial. The warden over there is Charon, and those who are ferried over the waves are the buried

It is forbidden to convey them past the banks of dread and over the snarling current before their bones have found rest in a due burial place ; instead they must roam here flitting about the river banks for a hundred years, and not until then are they accepted and find their way home to the pools which are now their hearts' desire.[88]

মধুসূদনের অনুকৃতি এ অংশে অত্যন্ত দুর্বল। তিনি নদীতীরে এক অদ্ভুত সেতুর কথা বলেছেন যেদিকে লক্ষ কোটী প্রাণী ছুটে চলেছে। তিনি প্রশ্ন করছেন যে, সেতুটি বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করছে কেন এবং অগণ্য প্রাণীও বা সেদিকে ছুটে চলেছে কেন। মায়াদেবী তার উত্তরে বলছেন :

কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপী পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যাজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্ম পথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জ্বলে জ্বলে পাপ প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।[89]

ইনিদ কাব্যে ইনিস যখন নদীর তীরে এল তখন নৌকাচালক তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা যেই হও, তোমাদের গতি সংযত কর ; বল, কোথা থেকে আসছ। এটা ছায়ার দেশ, ঘুমের দেশ এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রির দেশ। এ নদী সকলে অতিক্রম করতে পারে না।

Whoever you are who stride in arms towards my river, come, say why you approach. Check your pace, speak now, from where you are. This is the land of the shade of sleep and of Drowsy Night. It is sin to carry any who still live on board the boat of Styx.[৪৪]

তখন ইনিদের সঙ্গিনী 'এপোলো' দেবতার পূজারিণী উত্তরে বললেন যে, তাঁদের কোন অসদুদ্দেশ্য নেই এবং তাঁদের সে পথে আসার অধিকার আছে। এই বলে তিনি মন্ত্রপূত বৃক্ষশাখা তাকে দেখালেন। বৃক্ষশাখা দেখে প্রহরী বিনীত হল এবং তাঁদের যাত্রায় বাধা দিল না।

And she showed the branch which had been hidden in her garment. The storm of anger in Charon's heart subsided and he said no more of them.[৪৫]

এর পর তাঁরা নদী অতিক্রম করলেন।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে এ অংশের অনুকৃতি এভাবে ঘটেছে:

ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী,
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
শুধিলা কৃতান্তচর, 'কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসী, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!' হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিলা সতীরে;—
'কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!'

বৈতরণ নদী পার হইলা উভয়ে।
লোহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি ![৪৬]

'ইনিদ'-এ নদী পার হয়ে ইনিস এল বিভিন্ন বেদনা, পীড়া, লাঞ্ছনা এবং দুঃখের ক্ষেত্রে। সে অংশের বর্ণনা Jackson Knight-এর অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ

Immediately cries were heard. These were the loud wailing of infant souls weeping at the very entrance-way ; never had they had their share of life's sweetness for the dark day had stolen them from their mother's breasts and plunged them to a death before their time. Next to them are those who had been condemned to die on a false accusation. But here their places are always justly assigned by a jury chosen by lot ; for Minos, as president of the court, shaken the urn, convenes a gathering of the silent, and gives a hearing to the accounts of lives lived and changes made. Beyond these souls, in the next places, dwell the sorrowful who, though without guilt, gained death for themselves by their own hand, flinging their lives away in utter loathing for the light. How willingly they would now endure all the poverty, and every harsh tribulation, in the bright air above ! But Divine Law bans their way back, the unlovely marsh holds them bound behind its doleful waters, and the nine encircling coils of Styx confine them. Not far thence are displayed the fields of Mourning, as they name them, and they stretch in

every direction. Here there are secluded paths and a surrounding myrtle-wood which hides all those who have pined and wilted under the harsh cruelties of love. Even in death their sorrow never leave them. In this region Aeneas could see Phaedra and Procris and Eriphyle, grieving and showing the wounds dealt her by her brutal son, and Evadne, and Pasiphae ; and with them went Laodamia, and Caeneus who had in youth for a time been male but is now a woman, having been destined again to revert to her original shape.

আর মধুসূদনের রামচন্দ্র নরকে যা দেখলেন তা চরম বীভৎস ও বিকল। ভাষা আড়ষ্ট, গতিহীন বাক্য-বিন্যাস অত্যন্ত শ্লথ এবং সম্পূর্ণ চিত্রটি শিল্প-বিচারে আপত্তিজনক এবং অহেতুক কষ্ট কল্পনায় ভারাক্রান্ত। উদাহরণটি এই :

অস্থিচর্মসার যারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নি তেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে—
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্ত হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ

শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানল তাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! ইত্যাদি—[৪৭]

অষ্টম সর্গের বিদেশী প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে আমি আমার আলোচনার মূলসূত্রকে অনেকটা অতিক্রম করে এসেছি। এই সর্গটি অনেকটা অহেতুক সংযোজন। মধুসূদন ইচ্ছে করলে দেবতাদের কৃপায় সহজেই লক্ষ্মণকে বাঁচাতে পারতেন, দশরথের কাছে নরকে রামচন্দ্রকে টেনে নেওয়ার কোন দরকার ছিল না। মূল রামায়ণের বিশল্যকরণী নিয়ে এলেও চলতো। মধুসূদন নিজেও তাঁর বিভিন্ন পত্রে এ সর্গ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি। তিনি শুধু ইনিদের প্রভাবের কথাই বলেছেন—

Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Aeneas.[৪৮]

নবম সর্গে আমরা আবার প্রকাশ্য দিবালোক দেখছি। এখানে আমরা বেদনার্ত রাবণকে পাই পুত্রের সৎক্রিয়ার জন্যে, রামচন্দ্রের কাছে সপ্তদিন যুদ্ধক্ষান্তের আবেদন জানাচ্ছে। কোথাও কোন গোপনতা নেই, বরঞ্চ আশ্চর্য সজীবতায় শত্রু রামচন্দ্রের প্রশংসা সে করছে ঃ

তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল, রঘুপতি!
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনী স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি,
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;

দৈববশে রক্ষঃপতি পড়িত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি ।[৪১]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মধুসূদন রাবণের চরিত্রকে পরিপূর্ণ করেছেন বিশেষ আবেগের মধ্যে তাকে জাগরিত করে এবং শক্তিমান মানসিকতার মধ্যে। তার জীবনের দৃশ্যমান বিস্তার এখানে নেই, রাবণ আপনার হৃদয়ের সত্যে আপনাকে নির্মাণ করেছে। মধুসূদন আবার অন্ধকার এবং আলোকের রূপকগত বৈপরীত্য এনেও রাবণ চরিত্রের পূর্ণতা জ্ঞাপন করেছেন।

টীকা

১. বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণে' মহাকাব্যের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে একসময় লিখেছিলেন—'I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan.' 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থটি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছিলো। মহাকাব্য সম্পর্কে বিশ্বনাথের মন্তব্য ছিলো—(ক) মহাকাব্য হবে সর্গ দ্বারা গঠিত অষ্টাধিক সর্গের ছন্দোবদ্ধ কাহিনী, (খ) মহাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন দেবতা বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি গোত্রের কেউ। আবার একই বংশের জাতকুলীন একাধিক রাজাও একসঙ্গে নায়ক হতে পারেন। (গ) শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের মধ্যে যে কোনও একটি হবে মহাকাব্যের অঙ্গীরস এবং বাকী সমস্ত রস হবে অঙ্গরস, (ঘ) মহাকাব্য রচিত হবে ঐতিহাসিক বা কোনও সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, (ঙ) মহাকাব্যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার বর্গের কথাই থাকবে কিন্তু একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে, (চ) প্রত্যেকটি সর্গে এক রকম ছন্দ থাকবে এবং প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে। (দ্রষ্টব্য: সাহিত্য-দর্পণ: বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পুস্তকশ্রী কলিকাতা ৯, ১৩৭৬।

২. গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—খৃঃ পূঃ ৩২২) তাঁর Poetics নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে মহাকাব্য হচ্ছে ছন্দোবিন্যাসের

মাধ্যমে একটি দীর্ঘ পরিসরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুভূতি। মহাকাব্য অমিশ্রিত ছন্দে রচিত একটি কাহিনী। মহাকাব্যে সময়ের কোনও সীমা নির্দিষ্ট থাকেনা যেখানে ট্রাজেডীতে একটি পূর্ণ দিবসের আলোকিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। (Aristotle's Poetics : The Argument by Gerald F. Else : Leiden—E. J. Brill 1957.)

৩. Homer : The Odyssey, translated by Robert Fitzgerald, Heinemann, London, 1962—হোমারের 'ওডিসি' মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিতির জন্য এ অনুবাদটি নির্ভরযোগ্য এবং উপভোগ্য। গ্রীক উচ্চারণে নায়কের নাম 'ওদিস্‌সিউস' এবং লাতিন উচ্চারণে 'ইউলিসিস'।

৪. মেঘনাদবধ কাব্য : ১ম সর্গ : চরণ ৩০৮—৩১৬।

৫. ঐ চরণ ৭৬৪—৭৭০।

৬. "অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্‌ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র‌সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"
—রঘুবংশম্‌, প্রথম সর্গঃ চরণ ৭—৮।

৭. মেঘনাদবধ কাব্য : ১ম সর্গ : চরণ ২৭—৩২।

৮. ঐ ৪র্থ সর্গ : চরণ ১৩—২০।

৯. যেমন—
"বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ গগার্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥"
—রঘুবংশম্‌, প্রথম সর্গঃ চরণ ১—২।

১০. This is a tale of arms and of a man. Fated to be an exile, he was the first to sail from the land of Troy and reach Italy, at its Lavinian shore. He met many tribulations on his way both by land and on the ocean ; high Heaven willed it, for Juno was ruthless and could not forget her anger. And he had also to endure great

suffering in warfare. But at last he succeeded in founding his city, and installing the gods of his race in the Latin land ; and that was the origin of the Latin nation, the Lords of Alba, and the proud battlements of Rome.

"I pray for inspiration, to tell how it all began, and how the Queen of Heaven sustained such outrage to her majesty that in her indignation she forced a man famed for his true-heartedness to tread that long path of adventure, and to face so many trials." (Virgil : The Aeveid, A new translation by W. F. Jackson Knight— The Penguin Classics, 1956).

১১. Dante : The Divine Comedy, Translated by Dorothy L. Sayers. The Penguin Classics 1949 দ্রষ্টব্য।

১২. "And chiefly thou, O Spirit that dost prefer
Before all temple th' upright heart and pure,
Instruct me, for thou know'st ; thou from the first
Wast present, and with mighty wings outspread
Dove-like sat'st brooding on the vast abyss,
And mad'st it pregnant : what in me is dark
Illumine, what is low raise and support ;
That to the height of this Great argument
I may assert eternal Providence,
And justify the ways of God to men.
(Paradise Lost, Book I. 17—26

১৩. কিং লীয়র নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এড্গারের উক্তি ;

১৪. মেঘনাদবধ কাব্য : ২য় সর্গ : চরণ ১—২।

১৫. ঐ ৫ম সর্গ, চরণ ১।

১৬. ঐ ৮ম সর্গ, চরণ ১—৫।

১৭. ঐ ৭ম সর্গ, চরণ ১—৫।

১৮. Hyperiob : Fragment : Book 1. 1—14.
(The Pochhnk works of John Keats. London Oxford Hmidit Press 1934).

১৯. মেঘনাদবধ কাব্য : ১ম সর্গ, চরণ ৭৫৫—৭৬০।

২০. মেঘনাদবধ কাব্য : ৩য় সর্গ, চরণ ৪৭—৬০।

২১. ঐ চরণ ৩১৫—৩২৮।

২২. ঐ চরণ ১৬০—১৬৬।

২৩. ঐ চরণ ২৩৭—২৪৪।

২৪. ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ঐ চরণ যথাক্রমে ২৫৪—২৫৬, ৩১৩—৩৬৬, ৪৯৭—৫০০, ৫০৮—৫১০, ৫১২—৫১৩।

২৯. ঐ ৭ম সর্গ, চরণ ৩৫৫—৩৮৬।

৩০. ঐ ৬ষ্ঠ সর্গ, চরণ ৪৮৬—৪৯০।

৩১. ঐ চরণ ৪৯৩—৪৯৭।

৩২. ঐ চরণ ৬২৯—৬৪১।

৩৩. ঐ চরণ ৭০৪—৭০৮।

৩৪. W. F. Jackson Knight কৃত অনুবাদ।

৩৫. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮ম সর্গ, চরণ ১৬৪—১৭৪।

৩৬. ঐ চরণ ২১৮—২২০।

৩৭. Dante : The Divine Comedy, Translated by Dorothy L. Sayers. The Penguin Classics, 1949. (I. Inferno—Canto III).

৩৮. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮ম সর্গ, চরণ ৩১০—৩১২।

৩৯. The Odyssey : Homer. Translated by Robert Fitzgerald. Heinemann. London 1962. (Book Eleven. Lines 576—579).

৪০. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮ম সর্গ, চরণ ৮০৪—৮০৮।

৪১. ৩৯নং দেখুন, চরণ ২১৯—২২২।

৪২. W. F. Jackson, Knight কৃত অনুবাদ।

৪৩. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮ম সর্গ, চরণ ১৮৫—১৯৮।

৪৪, ৪৫. W. F. Jackson' Knight কৃত অনুবাদ।

৪৬. মেঘনাদবধ কাব্য : ৮ম সর্গ, চরণ ১৯৯—২১৬।

৪৭. ঐ চরণ ২২০—২৩৯।

৪৮. রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র। ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত **কবি মধুসূদন** ও তাঁর পত্রাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ১৪৭। (প্রকাশক, গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা-৯, ১৩৭০ ।

৪৯. মেঘনাদবধ কাব্য ১ম সর্গ, চরণ ৭৮—৯০।

মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা

মহাকাব্যে মানবজীবনের অংশবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ কোন একটি দিকের পরিচর্যা থাকে না ; কিন্তু জীবনের পরিপূর্ণতার পরিচয় থাকে। কবি বিভিন্ন কৌশলে এই পরিপূর্ণতাকে স্পষ্ট করেন। কবি আপন ভাষার মৌলিক শব্দভাণ্ডার এবং বাক্যের অম্বয়শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করেই তার মধ্যে নতুন ভাবস্পন্দন এনে থাকেন এবং এভাবেই মহাকাব্যে জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা জাগে। চরিত্রনির্মাণে, ঘটনা এবং অবস্থার বর্ণনায় এবং সর্বোপরি কাহিনীকে রূপ দেওয়ার মধ্যে এ-পরিপূর্ণতার পরিচয় পাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবি-জীবনের বিস্তৃতির এবং বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন।

চরিত্রনির্মাণে পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্যে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার ক্রমপ্রসার এবং অবিরল ব্যঞ্জনার সুযোগ নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সর্গে আমরা প্রমীলার পরিচয় পাই। প্রমীলা স্বামীবিরহে কাতরা এবং স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় দ্বিধাহীন জীবনমুক্তির কামনা করছে। সম্পূর্ণ সর্গে প্রমীলার যে পরিচয় পাই তা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। এমন কখনও মনে হয় না যে প্রমীলা বিভিন্ন মুহূর্তে কারণ-বিশেষে বিভিন্ন আবেগের অধীন হয়েছে ; কিন্তু মনে হয় যে তার সম্পূর্ণ সত্তা একটা বিশেষ সত্যকে জাগ্রত করতেই উন্মুখ হয়েছে। তার চরিত্রের পূর্বাপর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না, সম্পূর্ণ জীবনের প্রবাহেরও পরিচয় আমরা চাই না। যে মুহূর্তে সে প্রকাশিত সে মুহূর্তেই সে সম্পূর্ণ এবং সে মুহূর্তেই তার চরিত্র সর্বরূপে

বিকশিত। কবি এই পরিপূর্ণতার পরিচয় এনেছেন সমধর্মী উপমার ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনা এনে। বেদনা-ব্যাখ্যায় এবং আবেগের তীব্র গতি—উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমপ্রসারিত সমধর্মী উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্গের আরম্ভেই বেদনাধর্মী উপমার ব্যঞ্জনা রয়েছে :

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশ! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীতধ্বনি।[১]

এখানে শৃঙ্খলিত রূপে অনেকগুলো উপমা এসেছে এবং সব কয়টি উপমা মিলে এমন একটি আচ্ছন্ন অবস্থার পরিচয় এসেছে যার মধ্যে কোনও ছেদ নেই—একটি পরিপূর্ণ নিঃসংশয় বেদনার আচ্ছন্নতা। কৃষ্ণবিরহে সংসারের সর্বকৃত্য থেকে রাধার যে বেদনাময় মুক্তি এবং অনুক্ষণ বিবশা রাধার যে ব্যকুলতা তার সঙ্গে এখানে প্রমীলার ব্যকুলতার তুলনা করা হয়েছে। আবার শূন্যনীড়ে উদ্‌ভ্রান্ত কপোতীর উপমাও আনা হয়েছে এবং সর্বশেষে সমস্ত আনন্দের নীরবতার ছবি তিনি এঁকেছেন একথা ব'লে যে 'নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, গীতধ্বনি'। আরও কিছুদূর গিয়ে অন্য একটি উদাহরণের মধ্যে একই বেদনার বিক্ষেপ পাই :

কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির নীরে, কে পারে কহিতে ?
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
'তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !'[২]

প্রমীলার মানসিক অবস্থার পরিচয় পেলাম। কবি বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ এ অবস্থার একটি একাগ্র রূপ আঁকতে চেয়েছেন। এখানে উপমার প্রয়োগ না হলে আমরা শুধু একটি অবস্থার বিবৃতি পেতাম ; কিন্তু প্রমীলার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতাম না। উপমাবিহীন বেদনাবিবৃতি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যে'র শচী চরিত্রকে অত্যন্ত লঘু, অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছে। 'বৃত্রসংহারে'র চতুর্থ সর্গে শচীর মানসিক অবস্থার পরিচয় হেমচন্দ্র দিয়েছেন। শৃঙ্খলিত উপমার ব্যঞ্জনায় চরিত্র যে কত উজ্জ্বল হয় তার পরিচয় আমরা প্রমীলার ক্ষেত্রে দেখেছি, শচীর ক্ষেত্রে দেখবো যে নিছক বেদনাবিলাস বিলাপে রূপান্তরিত হয়ে চরিত্রকে সম্পূর্ণ নির্জীব করেছে :

সায়াহ্নে সখীর সনে বসিলা নৈমিষ বনে,
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
'বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া ॥
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে ॥'[৩]

মধুসূদন প্রমীলার পরিচয় এনেছেন বিভিন্ন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষায়— প্রমীলার সাজসজ্জা এবং যাত্রার ব্যাখ্যায়। এ ব্যাখ্যায় আমরা আবেগের তীব্রতার নিশ্চিন্ত গতি এবং দ্বিধাহীন জীবনমুক্তির পরিচয় পাই। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক) কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?[৪]

(খ) রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা! কিরীটছটা কবরী উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী শিরে
ইন্দ্রচাপ।[৫]

গ) চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি শিখা।[৬]

(ঘ) যথা বায়ু সখা সহ দাবানল গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু, উড়িল চৌদিকে;
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।[৭]

প্রথম উপমাটি, একটি বিশেষ আবেগের পরিচয়সূচক সর্বশেষ এবং সর্ব-সম্পূর্ণ ইঙ্গিত। উচ্চ পর্বতের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিম্নগতি যে নদী সমুদ্রের দিকে দ্রুতগামী, গতির পরিচয় অর্থে এটাই কি সর্বশেষ অলঙ্কার নয়? এখানে প্রশ্নের অপেক্ষা নেই। এই উপমায় কবির নিশ্চিন্ত—বোধের পূর্ণজ্ঞানের স্বীকৃতি আছে। কবি যদি প্রান্তিক প্রবহমান নদীর গতির কথা বলতেন, তাহলে সে গতি দ্বিধাহীন এবং নিশ্চিন্ত হতো না, সেখানে মন্থরতার সুযোগ থাকতো। একই তীব্রতা, বিমুক্ত প্রসার এবং সমগ্রপ্রাণতার পরিচয় দাবানলের উপমার মধ্যে এসেছে। বায়ুর সহযোগিতায় দাবানলের গতি যেমন দুর্বার, প্রমীলার গতিও তেমনি দুর্বার ও নিঃশঙ্ক।

চতুর্থ সর্গে করুণাবোধের অনুষঙ্গী বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা এবং অনবরত বিভিন্ন সমান্তরাল উপমার প্রশ্রয়ে সীতা চরিত্র যেভাবে ভাস্কর হয়েছে,

অন্য কোন উপায়ে সীতাকে সেভাবে স্পষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। মধুসূদন এই সর্গে বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেক দূর বিস্তৃত করেছেন। যে ভাষায় হৃদয়াবেগের বিবৃতি মাত্রই ছিল সজীব প্রাণ-পরিচয়ের সর্বশেষ কথা, সে ভাষাকে উপমা-রূপকের প্রাচুর্যে উচ্ছল ক'রে নিবেদিতপ্রাণ এবং সর্বংসহা সীতা-চরিত্রের উজ্জীবন অসাধারণ কুশলতার পরিচায়ক। মধুসূদনের সময়ে ব্যবহৃত বাংলার মৌলিক শব্দ ভাণ্ডারে যে এত ঐশ্বর্য এবং সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা তখন কে ভাবতে পেরেছিল? (অন্ত্যযমক নির্বিচারে পরিহার করে যতিতে অর্থব্যক্তির প্রয়োজন বিভিন্ন রূপে বিন্যস্ত ক'রে এবং অনবরত উপমা রূপকের ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনায় বাংলা ভাষাকে তিনি যে অসাধারণ শক্তিশালী করেছিলেন তার পরিচয় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা ও সীতা চরিত্র বিকাশের মধ্যেই পাই।) চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার কাছে আপন বেদনার পরিচয় দিচ্ছে। এখানে সে একান্তভাবে স্মৃতিনির্ভর; কিন্তু সর্বপ্রকার আচ্ছন্নতামুক্ত। বেদনা সমর্থিত উপমা প্রয়োগ করে সে সমস্ত ইতিহাসকে দৃশ্যগোচর করেছে। অনেকগুলো উপমার ক্ষেত্রে মধুসূদন একই সঙ্গে ধ্বনিমাহাত্ম্য এবং ব্যাখ্যাসূত্রকে অবলম্বন করেছেন। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে কবিতায় ধ্বনির বোধ প্রতিটি শব্দকে প্রাণবন্ত করে এবং চিন্তা ও মননের সর্বপ্রকার জাগরণের অনেক গভীরে প্রবেশ করে; প্রাথমিক শিথিল এবং বিস্মিত অর্থকে আহরণ করতে চায়—একই সঙ্গে আরম্ভ এবং শেষ, আদিম এবং বর্তমানকে সন্ধান করে। শব্দার্থের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় আমরা একই সঙ্গে প্রাচীন বিলুপ্ত সংস্কারকে এবং আধুনিক সচেতনাকে পাই। ধ্বনিবোধের এহেন পথযাত্রাকে শ্রোত্রকল্পনা বলতে পারি।

এ শ্রোত্রকল্পনায় কবির অভিজ্ঞতার বিন্যাস আছে। বিস্ময় এবং আনন্দ, শঙ্কা এবং জাগরণ পাঠকের হৃদয়েও সাড়া জাগায়। তাই বলা হয়ে থাকে যে মহৎ কবিতার উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হয়; কিন্তু সাধারণ চেতনার কবিতাকে আমরা অনবরত অতিক্রম করে আসি।

চতুর্থ সর্গ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:[৮]

(ক) হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরে বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।

(খ) বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমনি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

(গ) হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-বারি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!

বিভিন্ন ব্যঞ্জনের ধ্বনিসাম্যে ত বটেই, অধিকন্তু (আবেগ-নির্ভর উপমার প্রশ্রয়ে বিস্ময়, আনন্দ এবং জাগরণের পরিচয় এসেছে।) উপমা যদি বিস্ময় এবং আনন্দ না জাগায় এবং উপমেয়ের নিঃসংশয় প্রাণচেতনাকে যদি জাগ্রত না করে তবে সে উপমার কোনো মূল্য নেই। উপমানের দ্বারা উপমেয় অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত হয়, কিন্তু অলঙ্কারই তার শেষ নয়—লক্ষ্য রাখতে হবে যে অলঙ্কৃত হয়ে বস্তুরূপ সজীব হয়েছে কি না। কালিদাসের কাব্যে অলঙ্কার সৌন্দর্য-হেতু কিন্তু সেখানে সৌন্দর্যই জীবন এবং সৌন্দর্যই সমস্ত কল্পনার শেষ, তাই কালিদাস অনবরত সৌন্দর্যের মধ্যেই সমস্ত প্রাণের জাগরণ দেখেছেন। কালিদাসের কাব্যে গতিময় উপমাও সৌন্দর্য-হেতু। আমি এখানে 'রঘুবংশ' থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

(ক) বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ কুমারঃ, কৢপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্ ।
শিলাবিভঙ্গৈর্মৃগরাজশাবস্তুঙ্গং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ।।[৯]
[সিংহশাবক যেরূপ শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ কুমার অজ সুনির্মিত সোপানমার্গ দ্বারা ভোজরাজ নির্দিষ্ট অত্যুচ্চ মঞ্চে আরোহণ করলেন ।]

(খ) তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায় ।
সমীরণোত্থের তরঙ্গলেখা, পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম ।।[১০]
[অনন্তর পবনবেগে সমুত্থিত তরঙ্গমালা যেমন মানস-সরোবরস্থিত রাজহংসীকে এক পদ্ম হ'তে অন্য পদ্মের নিকট নিয়ে যায়, তেমনি প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য এক রাজার সন্নিধানে নিয়ে গেল]

(গ) সঞ্চারিণীদীপশিখেব রাত্রৌ, যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা ।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ।।[১১]
[রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা অতিক্রম ক'রে গেলে রাজ-পথস্থিত অট্টালিকাসমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হ'য়ে থাকে, তদ্রূপ বিধাতার অতি মনোহর দৃষ্টিস্বরূপ ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করতে লাগলেন, তাঁরা সকলেই বিষাদে বিবর্ণভাব ধারণ করলেন ।]

উপরের তিনটি উদাহরণেই গতির কথা আছে ; কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই । গতিকে সজীব করবার জন্যে উপমা নির্মিত হয়নি, সৌন্দর্যের প্রকাশের জন্য গতির আদেশ সৃজিত হয়েছে । প্রথম উদাহরণে উপমেয় হচ্ছে—কুমার অজ কর্তৃক সোপান বেয়ে মঞ্চে আরোহণ । এর উপমান হচ্ছে সিংহশাবক কর্তৃক শিলাভঙ্গী দ্বারা উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ । এ উপমায় আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি নয় ; কিন্তু আরোহণকালে সুঠাম দেহবিন্যাসের সৌন্দর্যই কবির লক্ষ্য ছিলো । দ্বিতীয় উদাহরণে চলমান মুহূর্তে যৌবনবতী রাজকুমারীর দেহ তরঙ্গ বর্ণিত হয়েছে । এখানকার উপমেয় সংক্ষিপ্ত পদচারণের সংবাদ, কিন্তু উপমান সৌন্দর্য-হেতু বিস্তৃত—এক পদ্ম হ'তে অন্য পদ্মের নিকট রাজহংসীর নিছক গমন নয়, কিন্তু তরঙ্গায়িত

দেহের সচল ছন্দ, তৃতীয় উদাহরণেও গতির-কথা আছে, কিন্তু গতিকে অতিক্রম করেছে ইন্দুমতীর দেহসৌষ্ঠব এবং রূপপ্রভা যা'কে কবি ব'লেছেন সঞ্চারিণী দীপশিখা।

নিছক সৌন্দর্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের উপমা তীক্ষ্ণ ও সজীব নয়, অনেকটা মধ্যযুগীয় 'চন্দ্রের জিনিয়া রূপ'-এর মতো, যেমন ঃ

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।[১২]

অথবা—

কভু সাধ্বী ঋষি বংশ বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।[১৩]

অথবা—

রবিকর যবে, দেবী, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেননা হইবে সুখী, সর্ব-জন তথা,
জগতে-আনন্দ তুমি ভুবন-মোহিনী।[১৪]

এ প্রকৃতির উপমা মধুসূদনের কাব্যে বিরল না হ'লেও, মধুসূদনের বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে অন্য ক্ষেত্রে—গতিময় উপমার ক্ষেত্রে, প্রগাঢ় উপমা এবং বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপমা-ব্যঞ্জনায়। বাংলা কাব্যে এগুলো নতুন সৃষ্টি। এ নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কাছে ঋণী।

হোমারের ভাষায় দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা কখনও ছিলো না। একই বক্তব্যকে বিভিন্নরূপে উপস্থিত করে অজস্র সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে, অনেক অপ্রচলিত বাণীভঙ্গী নির্মাণ করে হোমার তাঁর মহাকাব্যের ভাষা সুনিপুণ ব্যঞ্জনায় গড়ে তুলেছিলেন। রচনারীতির প্রয়োজনে কবিতার জন্য একটি ভাষা নির্মিত হয়েছিলো। হোমারের ভাষার বিশিষ্টতা তাঁর উপমা

সৃষ্টির কৌশলের মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। হোমারের উপমাগুলো শুধুমাত্র বস্তুর রূপের অভিব্যক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট অলঙ্কার নয়। সে-গুলো নাট্যগুণ সমন্বিত। অর্থাৎ একটি কর্মকাণ্ডকে প্রকাশমান এবং অর্থবহ করবার জন্য কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যাসূত্রে একটি উপমা নির্মিত হয়েছে। যার দ্বারা মূল ঘটনা উপেক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে পাঠক মূল ঘটনার সাধর্ম্য আবিষ্কার করে বিস্মিত ও পুলকিত হন।[১৫]

হোমার অনেক সময় উপমা ব্যবহার করেছেন কর্মধারায় বিরতি অথবা পরিবর্তন আনবার জন্য। যখন দিয়োমিদ সুসজ্জিত হয়ে পথযাত্রায় বেরুচ্ছে তখন তার শিরোদেশকে মনে হচ্ছে হেমন্তের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। যখন হেকটর এবং প্যারিস ট্রোজানদের পক্ষে যোগ দিতে আসছে তখন তাদের আগমনকে মনে হচ্ছে ক্লান্ত নাবিকদের কাছে শীতল বাতাসের মতো। পাত্রকুস এর বিপর্যয়ের কারণে তার অশ্রুপাতকে তুলনা করা হচ্ছে পর্বত বিদীর্ণ-করে স্রোতধারায় নিঃসরণের সঙ্গে। ফেইয়াসিয়াকে প্রথম দেখে ওদিসিউস আনন্দিত হল যেমন করে অসুস্থ পিতার রোগমুক্তি দেখে সন্তানগণ আনন্দিত হয়। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সব কটি উপমাই কোনও না কোনও অবস্থার বিকাশ অথবা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তা ছাড়া প্রতিটি উৎপ্রেক্ষাই নাটকীয় ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত।[১৬]

কোনো মহান দৃশ্য অথবা বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য, অথবা সংগ্রামরত সৈন্যদল অথবা বিভিন্ন বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্ব 'হোমার'কে বিভিন্ন সমান্তরাল বিচিত্র উপমা নির্মাণের সুযোগে দিয়েছে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি সমধর্মী অনেকগুলো উপমা পর পর সাজিয়ে গেছেন! কখনও বা একই উপমার পুনরাবৃত্তি ক'রেছেন।

যে বস্তুর শক্তি বা সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা অধিকতর অবহিত সে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প অবহিত বস্তুর। যেমন নায়কের বীরত্ব অথবা শক্তিকে রূপ দেবার জন্য, সে যখন শত্রুব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ-অবস্থার তুলনা দেওয়া হয় সিংহের সঙ্গে যে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বলীবর্দের উপর। উপমেয়কে রূপ দেবার জন্য এখানে উপমান

যথাযথ হয়েছে। আক্রমণের তীব্রতা ব্যাখ্যার জন্য এবং আক্রমণকারী যে আক্রান্ত শত্রুর চাইতে বলশালী তা' প্রমাণ করবার জন্য এ উপমা যথেষ্ট সঙ্গত।

'হোমার' উপমার অলঙ্কারের দিকটিকে বিস্তৃত ক'রেছেন এমনভাবে যে শেষ পর্যন্ত উপমা তার নিজস্ব বেষ্টনরেখা অতিক্রম ক'রেছে।

হোমার দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে উপমা প্রয়োগ করেছেন: প্রথমত, বস্তুর চিত্রকল্প নির্মাণের জন্যে; দ্বিতীয়ত, ঘটনার প্রকাশমান রূপের তীব্রতা বা গভীরতা নির্ধারণের জন্যে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপমান ও উপমেয়-র মধ্যে জাতিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকাই সম্ভবপর। বস্তুত এখানে উপমাটি কাব্যগত অতিশয়োক্তির রূপ নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একিলিস পলায়নকারী শত্রুসৈন্য ধ্বংস ক'রে চ'লেছে এ-ঘটনাকে 'দাবানল একটি বনকে গ্রাস করছে' এর সঙ্গে তুলনা সম্পূর্ণভাবেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অতিশয়োক্তি হ'য়েও এটা যথাযথ, কেননা এখানে নায়কের অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং ধ্বংস-ক্ষমতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'হোমারে'র অনুকরণে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রচুর পরিমাণে গতিময় উপমা নির্মাণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই সমধর্মী নয়, বিষয় বা উপদেশের দিক থেকেও উভয়ের উপমা একজাতীয়। 'হোমারে'র কাব্যে সিংহ এবং অগ্নির উপমা এসেছে অনবরত। মধুসূদন 'হোমারে'র অনুকরণে বহুবার সিংহ এবং অগ্নির উপমা ব্যবহার করেছেন। আমি এখানে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে প্রথমে সিংহ এবং ব্যাঘ্রের উপমা এবং পরে অগ্নির উপমা উদ্ধৃত করব।

সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমা:

১। অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে![১৭]

২। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,

গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা![১৮]

৩। ভয়াকুল ফুল ধনুঃ পশিলা অমনি—
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি—
কেশরী কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে![১৯]

৪। উল্লাসে দেব চলিলা অমনি
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লক্ষ্মী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি গর্ভে।[১০]

৫। কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী![১১]

৬। কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে![১২]

৭। দক্ষিণ দুয়ারে ফেরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে![১৩]

৮। দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে![১৪]

৯। একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূরে গুল্ম-পাশে

চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দূলে
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ কুল-পতি,
সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে![২৫]

১০। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?[২৬]

১১। অতি দ্রুত চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।[২৭]

১২। ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী....................
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।[২৮]

১৩। বৃষপালে সিংহ যথা নাশিছে রাক্ষসে
শুরেন্দ্র।[২৯]

১৪। চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে বাঘিনী যেমনি—
জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে।[৩০]

এ-সমস্ত উপমাকে বস্তু বর্ণনা বলা চলে না, কেননা এ-সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বস্তুকে অলঙ্কৃত করা হয়নি, অধিকতর মনোহর করবার চেষ্টাও

নেই। চেষ্টা আছে বস্তুকে ব্যাখ্যা করবার, তার শক্তি নির্ণয়ের এবং তার প্রাণধর্ম নির্ধারণের। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই মধুসূদন যে সার্থক হয়েছেন তা' বলা চলে না। সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু নির্মাণের আবেগে অনেক সময় কবি প্রয়োগসিদ্ধতার কথা চিন্তা করেননি। তৃতীয় উদাহরণটি এর একটি নিদর্শন। কামদেবের ফুল ধনু ভবানীর বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করল যেন কেশরিণীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করল সিংহ-শাবক। এখানে অসঙ্গতির প্রকাশ পেয়েছে। ফুল-ধনু আশ্রিত হয় না—চঞ্চল করে এবং রিরংসা জাগায়।

প্রথম উপমাটি সংবাদ-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাই তার বিস্তার আছে এবং ব্যাখ্যা আছে। রামচন্দ্র আক্রমণ করলেন কুমারকে যেমন করে সিংহ আক্রমণ করে বৃষকে। মূলত এ দুইটিই হচ্ছে সমান্তরাল ঘটনা; কিন্তু কবি বৃষস্কন্ধে সিংহের লম্ফপ্রদানকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। কবির লক্ষ্য হ'ল রামচন্দ্রের আক্রমণের উপর এ-সমস্ত গুণ আরোপ করা।

দ্বিতীয় উদাহরণে সিংহ এসেছে গৌণভাবে। এখানে মুখ্য উপমান হল ব্যাধ-দল কর্তৃক গহন কানন বেষ্টন।

অষ্টম উদাহরণে সীতার অসহায়তার সঙ্গে রাক্ষসদের নিশ্চিন্ততার প্রতিতুলনা নির্মিত হয়েছে—একদিকে হীন-প্রাণা হরিণী, অন্যদিকে নির্ভয়-হৃদয় বাঘিনী। উপমাটি এখানে অত্যন্ত সজীব এবং আশ্চর্যরূপে যথাযথ।

নবম উদাহরণে মধুসূদন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। এটাকে বলতে পারি স্মৃতিনির্ভর বেদনাবৃত্তি। উপমানের একটি বিস্তার আছে, যাকে বলা যায় illustrative imagery। 'ভাজিলে'র 'ইনিদে'র মধ্যে এ-ধরনের কাহিনীগত চিত্রধর্মী উপমা আছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি একটি ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেওয়া:

'Speaking thus, and quicker than speech, he made the hearing ocean calm. He routed the gathered clouds and brought back the sun. As he did so, Triton and Cymothoe

pressed against the ships, and dislodged them from the cutting rocks; and Neptune aided them, levering with his trident. Greak sandbanks reappeased, as, lightly skimming the wave crests in his chariot, he calmed the sea. It had been like a sudden riot in some great assembly, when, as they will, the meaner folk forget themselves and grow violent, so that firebrands and stones are soon flying, for savage passion quickly finds weapons. But then they may chance to see some man whose character and record command their respect. If so, they will wait in silence, listening keenly. He will speak to them, calming their passions and guiding their energies. So now, all the uproar of the ocean subsided. Its lord, Father Neptune, had only to look forth over the sea; then under a cloudless heaven he wheeled his horses, gave the rein, and let his willing chariot fly.[৩১]

দেবতা কথা বললেন। কথা বলার চেয়েও দ্রুততার সঙ্গে তিনি উত্তাল সমুদ্রকে শান্ত করলেন এবং পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়ে দিবসের সূর্যকে মেঘমুক্ত করালেন। সাইমোথোয়ে ও ট্রিটনের সহযোগিতায় দেবতা শিলাস্তূপে আবদ্ধ জাহাজগুলোকে বাইরে ঠেলে মুক্ত করে দিলেন। তিনি ত্রিশূল দিয়ে শিলারাশিকে স্তূপীকৃত করলেন, চোরাবালিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরী করলেন আর সমুদ্রকে শান্ত করলেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর রথের চাকা চালিয়ে নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে আমরা যেমন দেখি যখন কোন জনমণ্ডলীর মধ্যে আকস্মিকভাব গোলযোগের সৃষ্টি হয় বা নিম্নজাতীয় জনতা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন ক্রোধবশতঃ তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং পাথর বা অস্ত্রাদি ছুড়ে মারতে থাকে; কিন্তু এ-সময় ঘটনাচক্রে কোন মর্যাদাসম্পন্ন ও পুণ্যবান

ব্যক্তির আবির্ভাব হলে তারা নীরবে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি তখন অমৃতবচনে তাদের আত্মার পথ নির্দেশ করেন এবং তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করেন। ঠিক তেমনি দেবতাও সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সমুদ্রের গর্জনও আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়; আর তাঁর অশ্বদল এগিয়ে চলে। রথের গতি দ্রুত করার জন্য তিনি হাতের বল্গা শিথিল করে দেন।

অগ্নির উপমা ঃ

১। সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভ আকাশ মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।[৩২]

২। শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।[৩৩]

৩। অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ মন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা।[৩৪]

৪। যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্ন-শিখা? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা বল-দলে।[৩৫]

৫। চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি শিখা ঘরে।[৩৬]

৬। যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণ বারিদ-পুঞ্জে![৩৭]

৭। অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উপরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে![৩৮]

৮। যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌরজন।[৩৯]

৯। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।[৪০]

১০। দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী।[৪১]

১১। রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিল দূতে।[৪২]

১২। জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে।[৪৩]

১৩। যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে।[৪৪]

১৪। হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমেষে, কলাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।[৪৫]

১৫। দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন।[৪৬]

এ-উদাহরণগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মধুসূদনের অগ্নির উপমা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সিংহ-ব্যাঘ্রের উপমার চেয়ে সঙ্গততর। সিংহ-ব্যাঘ্রের ক্ষেত্রে অপরিচয়ের জন্যই উপমা সর্বত্র যথাযথ হয়নি; কিন্তু অগ্নির বিভিন্ন রূপ, পরিচিত সীমানার মধ্যে বাঙালী জীবনে অত্যন্ত সত্য ও নৈমত্তিক। শুষ্ক তৃণে অগ্নি প্রজ্জ্বলন, গ্রাম্য-গৃহে অগ্নি-দাহন, বনস্থলে দাবানলের ধ্বংসলীলা—বাঙালী জীবনে অপরিচিত ব্যাপার নয়। এ চিত্রগুলোকেই মধুসূদন বারবার ব্যবহার করেছেন, এ-উপমাগুলো আপন অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত।

আরও স্পষ্টভাবে বাঙালী জীবনের আনন্দ, আচরণ এবং বিশ্বাসের পরিচয়সূচক অনেকগুলো উপমা মধুসূদন ব্যবহার করেছেন যেমন:

হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবল,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে[৪৭]

অথবা—

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।[৪৮]

অথবা—

ক্লান্ত শিশুকুল
জননী ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লাভিলা।[৪৯]

মধুসূদন উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করেছিলেন, একথা পূর্বেই ব'লেছি। সিংহ এবং অগ্নি উভয় উপমাই 'হোমার' থেকে গৃহীত; কিন্তু অগ্নির উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ বা অনুসরণের পরিচয় নেই।

সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ অনেক বেশী স্পষ্ট। এখানে একই উপমার পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

যে যুগে 'হোমার' কাব্য রচনা করেছিলেন সে-যুগে শ্রোতার আনন্দময় স্বীকৃতি দ্বারা কাব্যের মূল্য নির্ণীত হ'ত। একত্রিত শ্রোতৃবর্গ কাব্যের পাঠক্রম অনুসরণ ক'রে কবিতার রসাস্বাদ করত। এ কারণে কবিকে বিশেষ কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হ'ত। শ্রোতা যাতে কাহিনীকে অনুসরণ করতে পারে এবং অনুসরণের সময় যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা না জাগে সেজন্যে ব্যাখ্যাযুক্ত দীর্ঘ উপমার প্রয়োজন হ'য়েছে, একই উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং ব্যক্তি নির্দেশক বিশেষণের ব্যবহার ঘটেছে। কবি শ্রোতার জন্যে কোনো কিছু রেখে দেন্‌নি। বক্তব্যের মর্মোদঘাটন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘটে—সেজন্যে উপমা বিলম্বিত এবং বিস্তৃত হ'য়েছে। প্রতিটি উপমা একটি পরিপূর্ণ চিত্ররূপে জে'গেছে। শ্রোতাকে উপমাটি অনুভব করাবার জন্যে চিন্তা ক'রতে হয়নি—কেননা উপমাটি পরিচিত দৃশ্যের উদঘাটন ক'রেছে। যেমন—"তার গাল বেয়ে চোখের পানি নেমে এল যেমন ক'রে পার্বত্য ঝরণার পানি কালো রেখায় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, 'পেত্রোক্লুস' একটি ছোটো মেয়ের মত কাঁদছে-যে-মেয়ে মায়ের কোলে উঠতে চায়। মায়ের আঁচল ধ'রে টানে, চোখভরা পানি নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় এবং যতক্ষণ না কোলে উঠতে পারে ততক্ষণ তার কান্না থামে না।' E. V. Rieu র ৫০ অনুবাদ থেকে আরও কতকগুলো উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১. Then he advanced on them like a mountain lion who sallies out, defying wind and rain in the pride of his power, with fire in his eyes to hunt the oxen or the sheep, to stalk the roaring deer, or to be forced by hunger to besiege the very walls of the homested and attack the pens. (Odyssey : Book VI)

২. Seizing the olive pole, they drove its sharpened end in to the Cyclops' eye, while I used my weight from

above to twist iti home, like a man boring a ship's timber with a drill which his mates below him twirl with a strap they hold at either end, so that it spins continuously. (Odyssey ; Book IX)

৩. Odysseus broke down as the famous minstrel sang this lay and his cheeks were wet with the tears that ran down from his eyes. He wept as a woman weeps when she throws her arms round the body of her beloved husband, fallen in battle before his city and his comrades, fighting to save his home-town and his children from the disaster. She has found him gasping ·in throngs of death ; she clings to him and lifts her voice in lamentation. But the enemy come up and belabour her back and shoulders with spears, as thəy lead her off into slavery and a life of miserable .toil, whith her cheeks wasted by her pitiful grief. Equally pitiful were the tears that now welled up in Odysseus' eyes. (Odyssey : Book VIII).

৪. He was like a stallion who breaks ·his halter at the manger where they keep and fatten him, and gallops off across the fields in triumph to his usual bathing dlace in the delightful river. He tosses up his head ; his mane flies back along his shoulner ! he knows how beautiful he if ; and away he goes, skimming the ground with his feet, to the haunts and pastures of the mares. Thus Hector sped away, when he had heard the god speak, to lead his charioteers to battle. (lliad ; Book XV).

[১ তিনি এক পার্বত্য সিংহের মত এগিয়ে এলেন। যে সিংহ শক্তিমদে মত্ত হয়, ঝড়-বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে অনিময় চক্ষে বলীবর্দ-মেঘ শিকারের জন্যে বা বিচরমান হরিণকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্যে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসে। অথবা যে সিংহ গোষ্ঠগৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে গৃহপালিত পশুদের আক্রমণ করে। (অডিসি—চতুর্থ খণ্ড)

২। অলিভ গাছের ডালটা সবাই মিলে ধরে সূক্ষ্মাগ্র দিকটা জোরে সাইক্লপ্‌সের চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। আমি ডালটার ওপরে আমার শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে রেখেছিলাম যাতে সেটা ভাল ভাবে তার চোখে ঢুকতে পারে। ঠিক যেমন করে জাহাজের তক্তা ছিদ্র করার সময় একজন তুরপুনের মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখে যাতে তা' ঠিকমত ঘুরতে পারে আর তার সঙ্গীরা নীচে দু'দিক থেকে চর্মপেটী ধরে তুরপুনটা ঘোরাতে থাকে! (অডিসি—নবম খণ্ড)

৩। খ্যাতনামা গায়কটি যখন এই গানটী গাইল ওডেসিয়াস তখন ভেঙ্গে পড়ল, অশ্রু ধারায় তার গণ্ডদেশ সিক্ত হল। তেমন করে সে কাঁদল—যেমন করে স্ত্রী অশ্রুপাত করে দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে পতিত প্রিয়তম স্বামীর দেহ আলিঙ্গন ক'রে। সে তাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ দেখে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করে; কিন্তু শত্রুরা এসে যায়, তার পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধে বল্লম দিয়ে আঘাত করে; তাকে নিয়ে যায় দাসত্ব ও দুঃসহ পরিশ্রমের মধ্যে, দুঃখের দাহনে তার গণ্ডদেশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ওডেসিয়াসের চক্ষুতে এখন যে অশ্রু উথলে উঠল তা তেমনি করুণ।

৪। আহারের পাত্র সংলগ্ন দড়ি ছিঁড়ে অশ্ব মুক্তির আনন্দে ছুটে যায় মাঠের দিকে, নদীর তীরে যে নদীতে সে কতবার গা ধুয়েছে। মাথা উঁচু করে সে দাঁড়ায়। ঘাড়ের কেশর বাতাসে উড়তে থাকে। কি সুন্দর সে। আবার সে ছুটে যায়। খুরের আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে। সে ছুটে যায় ঘোটকীদের চারণভূমিতে।—দেবতার কথা শুনে হেক্‌টরও ঠিক তেমনি করেই ছুটে যান যুদ্ধে, রথবাহিনী পরিচালনার জন্যে। ইলিয়ড—পঞ্চদশ খণ্ড)।]

'হোমার' অনুভূতি এবং হৃদয়াশ্রিত আবেগকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। যেখানে পাঠক অথবা শ্রোতাকে চিন্তা করতে হবে বা উপলব্ধি ক'রতে হবে সেখানে দৃশ্যমান বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ ক'রেছেন এবং প্রতিটি চিত্রই উপলব্ধির বিষয়কে লক্ষ্যগোচর করেছে। যেখানে বলা চলত যে 'মেয়েটি মায়ের কোলে যাবার জন্যে আকুল হয়েছে'—সেখানে তিনি আকুলতাকে চিত্রবৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তুলবেন, যেমন মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরে টানছে', 'পানি-ভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছে', 'যতক্ষণ না কোলে উঠতে পারছে ততক্ষণ কাঁদছে'—ইত্যাদি। এভাবে 'হোমার'ও তাঁর শ্রোতার জন্যে বিশ্লেষণের সুযোগ রাখেননি—প্রগাঢ় সহানুভূতি চিত্ররূপে দৃশ্যমান হ'য়েছে। শ্রোতাকে তিনি চমকিত ক'রেছেন, সন্ত্রস্ত করেছেন, বেদনাবৃত্তে আবর্তিত করেছেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও অর্থবোধের কারণে চিন্তিত করেননি।

টীকা

১। মেঘনাদবধ কাব্য ঃ তৃতীয় সর্গ ঃ চরণ ১—১৩।

২। ঐ চরণ ৪৮—৫৪।

৩। হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ বসুমতি কার্যালয়, ১৩১৪।

৪। মেঘনাদবধ কাব্য ঃ তৃতীয় সর্গ ঃ চরণ ৭৫—৭৭।

৫। ঐ চরণ ১১৫—১১৮।

৬। ঐ চরণ ১৩৩—১৩৪।

৭। ঐ চরণ ১৬০—১৬৬।

৮। ঐ চতুর্থ সর্গ ঃ চরণ ৫০—৫৫। খ. চরণ ১৬৯—১৭২। গ. চরণ ১৭৬—১৮৩।

৯। রঘুবংশম্ ঃ ষষ্ঠ সর্গ ঃ পংক্তি ৫—৬।

১০। ঐ পংক্তি ৫১—৫২।

১১। ঐ পংক্তি ১৩৩—১৩৪।

১২। মেঘনাদবধ কাব্য ঃ চতুর্থ সর্গ ঃ চরণ ১৬৭—১৬৮।

১৩। ঐ ১৮১—১৮৩।

১৪। ঐ ২১৭—২২৩।

১৫। The Outline of Literature, Edited by Gohm Drinkwater, London-George Newnes Limited, 1940. হোমার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৬। A Companion to Homer, Edited by Alan J. Wace and Frank H. Stubbingo, London, Macmillan & Co. Ltd, 1963, Sir Maurice Bowra লিখিত Composition নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। মেঘনাদবধ কাব্য ঃ প্রথম সর্গ ঃ চরণ ১৭৯-১৮২ ।

১৮। ঐ চরণ ২৩৮-২৪৩ ।

১৯। ঐ দ্বিতীয় সর্গ ঃ চরণ ৩৯৩—৩৯৭ ।

২০। ঐ চরণ ৫৫৫—৫৫৮ ।

২১। ঐ তৃতীয় সর্গ ঃ চরণ ৩৯৯—৪০১ ।

২২। ঐ চরণ ৪৭০—৪৭৩ ।

২৩। ঐ চরণ ৫৫৮—৫৫৯ ।

২৪। ঐ চতুর্থ সর্গ ঃ চরণ ৪৮—৫১ ।

২৫। ঐ চরণ ৩৪৯—৩৫৮ ।

২৬। ঐ পঞ্চম সর্গ ঃ চরণ ৬৯—৭২ ।

২৭। ঐ ষষ্ঠ সর্গ ঃ চরণ ৩—৬ ।

২৮। ঐ চরণ ২৯৫—৩০১ ।

২৯। ঐ সপ্তম সর্গ ঃ চরণ ৬৫০—৬৫১ ।

৩০। ঐ নবম সর্গ ঃ চরণ ২৩১—২৩৩ ।

৩১। Virgil : The Aeneid : A new Translation by W. F. Jackson Knight (The Penguin Classics, 1956) প্রথম পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১—৩২ ।

৩২। মেঘনাদবধ) ঃ প্রথম সর্গ ঃ চরণ ৪৩২ ৪৩৫ ।

৩৩। ঐ চরণ ৫৯০—৫৯৩ ।

৩৪। ঐ দ্বিতীয় সর্গ ঃ চরণ ৩৫৯—৩৬৪ ।

৩৫। ঐ তৃতীয় সর্গ ঃ চরণ ১৬০—১৬৬ ।

৩৬। ঐ চরণ ২৫৪—২৫৬ ।

৩৭। ঐ চরণ ৩৬৩—৩৬৬ ।

৩৮। ঐ চরণ ৪৯৭—৫০০ ।

৩৯। ঐ চরণ ৫০৮—৫১০ ।

৪০। ঐ চরণ ৫১২—৫১৩ ।

৪১। ঐ ষষ্ঠ সর্গ ঃ চরণ ৩৯২—৩৯৩ ।

৪২। ঐ সপ্তম সর্গ ঃ চরণ ১২৭—১২৯ ।

৪৩। ঐ চরণ ৩০৮।

৪৪। ঐ চরণ ৪৮৫—৪৮৮।

৪৫। ঐ চরণ ৬১১—৬১২।

৪৬। ঐ চরণ ৭০০—৭০৩।

৪৭। ঐ প্রথম সর্গ ঃ চরণ ২৬০—২৬৩।

৪৮। ঐ নবম সর্গ ঃ চরণ ৪৪২

৪৯। ঐ দ্বিতীয় সর্গ ঃ চরণ ১০—১৩

৫০। E. V. Rieu কৃত অনুবাদ The Iliad এবং Odyssey (The Penguin Classics)। Odyssey-র একটি সুন্দর পদ্যানুবাদ আছে Robert Fitzgerald কৃত। সেখান থেকে পাঠকের উপভোগের জন্য একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি।

"He pushed aside the bushes, breaking off
With his great hand a single branch of olive,
Whose leaves might shield him in his nakedness,
So come out rustling, like a mountain lion,
Rain-drenched, wind-buffeted, but in his might at ease,
With burning eyes—who prowls among the herds
Or flocks, or after game, his hungry belly
Taking him near stout homesteads for his prey."

(Homer, The Odyssey: Translated by Robert Fitzgerald—Heinemann, 1962—Book VI.)

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

'পৃথিবীর কবিতা কখনও মরেনা'—কীট্‌স এর[১] এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে পৃথিবীর একটি অনন্ত সৌন্দর্য আছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অনুভব করা যায়। ঊষালগ্নের প্রথম সূর্য কিরণে অনুভব করা যায়, নদীস্রোতে এবং পর্বতের রেখাবিন্যাসে উজ্জ্বল হয়, পুষ্প-সুগন্ধে প্রবাহিত থাকে, ঘন মেঘমালায় উদ্বোধিত হয়। সকল দেশের সকল কালের কবিরা জীবনকে প্রকৃতির আশ্রয়ে আবিষ্কার করেছেন এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ অনুভূতিকে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা এবং ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা ভাষার কবিতায় প্রকৃতির ব্যবহার চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যুক্তি দ্বারা বিন্যস্ত এবং আবেগের দ্বারা সমর্থিত।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃতির উদ্বোধন ঘটেছে বিচিত্রভাবে। রাধা-বিরহ উপলক্ষ্য হলেও প্রকৃতির স্তোত্রকে কাম্য করেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজীতে কীট্‌স যে ধরণের ওড (ode রচনা করেছিলেন যাকে প্রশস্তি আখ্যা দেয়া যায়। বাংলা কাব্যে সে ধরণের ওড লিখবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিলো। বিভিন্ন চিঠিপত্রে 'ব্রজাঙ্গনা'কে কবি ওড হিসেবেই আখ্যাত করেছেন।[২]

এককভাবে চিহ্নিত করলে 'ব্রজাঙ্গনা' শব্দে রাধিকাকেই বুঝায়। রাধা এবং তার বিরহ অবলম্বন করে কাব্যটি রচিত এ-কথা একটি পত্রে মধুসূদন উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকাশকালে কাব্যের আখ্যাপত্রে শ্রীকৃষ্ণ শর্মা রচিত 'পদাঙ্কদূতম' নামক সংস্কৃত কাব্যের একটি শ্লোক অংশতঃ উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি নিম্নরূপ :

'গোপীভর্তু' বিরহ বিধুরা কাচিদিন্দী বরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
তত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।'

এর অর্থ হচ্ছে গোপীনাথের বিরহে বিধুরা কোনও ইন্দীবরলোচনা উন্মত্তের মতো স্খলিতকারী হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মুররিপু বা কৃষ্ণ সেখানে আছেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দ্রুত গৃহত্যাগ করে যমুনাতীরের মঞ্জু কুঞ্জে গমন করলেন।

এই শ্লোকের অংশবিশেষ উন্নতির কারণে মনে হয় প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের বিবেচনায় মধুসূদন এই কাব্যে রাধার তিনটি রূপের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন—বিরহবিধুর, ভ্রান্তিদূতীসহায়া ও উন্মত্তা। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কলকাতার একজন কাব্যরসিক ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মধুসূদনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। মধুসূদন তাঁকে ব্রজাঙ্গনার সমস্ত স্বত্ব দান করেছিলেন। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত লিখেছিলেন, "সদয়হৃদয় কবিবর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্যগুণে এই গ্রন্থখানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এককালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্বগুণ দ্বারা এই গ্রন্থখানি কীর্তন পূর্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ কবরডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত আর এম, বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

"আপাততঃ এই গ্রন্থখানির বিরহ বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিনীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রমসাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করতঃ সোৎসুকচিত্তে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃকভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটন পূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান হইব।"[৪]

বৈষ্ণব কাব্যের রসোল্লাস 'ব্রজাঙ্গনা'য় পরিস্ফুট হয়নি। রাধাবিরহ এ-কাব্যের উপলক্ষ্য হলেও, মধুসূদনের বর্ণনায় এবং ব্যবহৃত শব্দের

ধ্বনি এবং ভাবানুষঙ্গে কবিচিত্তের একটি বিশ্রামের প্রয়াস এখানে উপলব্ধ হয়। বৈষ্ণব কবিতায় সমগ্র চিত্তের যে নিবেদন এবং আত্মবিলোপ আমরা আবিষ্কার করতে চাই, এ-কাব্যে তা আবিষ্কার করতে পারবোনা। মধুসূদনের অনুভূতি যখন প্রায় সর্বাংশে 'মেঘনাদ'কে নিয়ে সচকিত, সে-সময়কালের অবসরের লীলা-আলেখ্য হিসেবে 'ব্রজাঙ্গনা'কে আমরা পাচ্ছি। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে এ-অবস্থার উল্লেখ আছে—

"আমি এসঙ্গে আমার 'মেঘনাদে'র উন্মোচনী অংশ পাঠাচ্ছি। এ সম্পর্কে তোমার মতামত অবশ্যই জানাবে। এখানকার একজন বন্ধু, যার কবিতা সম্পর্কে ভালো বিবেচনাবোধ আছে, একে অসাধারণ বলে ঘোষণা করেছেন। ভালো কথা, আমি গীতি কবিতার একটি ছোটো বই ছাপাতে দিয়েছি। কবিতাগুলো আমাদের চিরদিনের রাধিকা এবং তার বিরহ নিয়ে। ছাপা হয়ে বেরোলেই তোমাকে এক খণ্ড পাঠিয়ে দেব।"[৫]

দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন কাব্য হিসেবে 'ব্রজাঙ্গনা'কে খুব বেশী গুরুত্ব দেননি, 'মেঘনাদ'ই তাঁর চিত্তকে সর্বাংশে অধিকার করে আছে। অন্য একটি পত্রে মধুসূদন লিখছেন।

"ভালো কথা, রাধার বিরহ ছাপা হচ্ছে। এ-বইটি প্রকাশ করতে আমার কেমন যেন দ্বিধা লাগছে। মিত্রচ্ছন্দ দিয়ে আমি কি করবো?"[৬]

এখানেও দেখি 'ব্রজাঙ্গনা'র ছন্দ রীতি যে মধুসূদনের শিল্পী স্বভাবের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয় সে ব্যাপারে কবি খুবই সচেতন ছিলেন।

রাজনারায়ণকে লিখিত আরও একটি পত্রে 'ব্রজাঙ্গনা'র উল্লেখ আছে।

"আমার মনে হচ্ছে, ব্রজের মহিলাকে তুমি উপেক্ষা করছ। ওগো বন্ধু, যখন তুমি কবিতা পড়বে ধর্মের সংস্কার তখন দূরে ঠেলে দেবে। তা'ছাড়া শ্রীমতী রাধা তেমন খারাপ মহিলাতো নন। যদি প্রথমাবধি অধীনের মতো একজন চারণ কবি তার জুটতো তা'হলে একেবারে নতুন রূপে তাকে তোমরা দেখতে পেতে। তথাকথিত কবিদের অশিষ্ট কল্পনাই তাকে এমনভাবে চিত্রিত করেছে।"[৭]

এ-চিঠিতেও আমরা লক্ষ্য করি, মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা'কে বিশেষ সমৃদ্ধ

কাব্য বলে মনে করছেন না। তিনি মন্তব্য করছেন যে যদি রাধিকাকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখতেন তা হলে রাধিকার একটি নতুন রূপ আমরা দেখতে পেতাম। এটি একটি সম্ভাবনার কথা যে সম্ভাবনার পথে মধুসূদন অগ্রসর হননি।

"ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সার্থকতা এখানে যে মধুসূদন এ-কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি সজীব বাণীমূর্তি নির্মাণ করেছেন। 'বংশী-ধ্বনি' কবিতায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে। কবি মনকে নৌকার সঙ্গে এবং প্রেমকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন—

"যাক্ মান, যাক্ কুল,
মন-তরী পাবে কুল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!"

বাংলাদেশের পুষ্পসুগন্ধ, ঋতু পরিবর্তন, নদীসমূহের গতিরেখা এবং রাত্রি-কালের আকাশের চাঁদ যা' আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সর্বমুহূর্তে ধারণ করে আছে মধুসূদনের 'ব্রজঙ্গনা'য় তার অপূর্ব রূপাভিষেক ঘটেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতির ব্যবহার পর্যাপ্ত কিন্তু সেখানে রূপকগত ব্যঞ্জনা নিয়েই প্রকৃতির বিকাশ এবং সার্থকতা। নিজস্ব অস্তিত্বে প্রকৃতি কান্তিময়ী নয়। কখনও আক্ষেপানুরাগে, কখনও অভিসার উৎকণ্ঠায়, কখনও রাস লীলায় প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ অনুভূতিকে রূপ দেবার জন্য প্রকৃতির প্রয়োজন হয়েছে। যেমন বর্ষাকালীন অভিসার উৎকণ্ঠার কবিতা। কয়েকটি উদাহরণ[৮] দিচ্ছি ঃ

১. রায়শেখরের একটি পদে—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।"

২. গোবিন্দদাসের একটি পদে—

"অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥.'

৩. গোবিন্দদাসের অন্য একটি পদে—

"মন্দির বাহির কঠিন কপট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তাহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল বনিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধনি পার॥
ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যতি॥"

কিন্তু মধুসূদনের কবিতায় প্রকৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব-জনিত কোনও আবেগ নয়। উদাহরণ স্বরূপ 'জলধর' কবিতার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা যায়—

"চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে!"

'যমুনাতটে' কবিতায় সকল বক্তব্যের পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির রেখাঙ্কন ঘটেছে। বক্তব্যের সূত্রপাত নদীকে লক্ষ্য করে। নদীর অনবরত কল্লোলকে কবি সাগরের জন্য নদীর অবিরাম বিরহ-বিক্ষোভ বলে বর্ণনা করছেন। রাধিকাও বিরহিনী বলে, নদীকে কবি বলছেন রাধিকার সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করবার জন্য। এখানে নদীই প্রাধান্য পেয়েছে, রাধিকা নয়, যেমন—

"মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?"

নদীকে সুসজ্জিতা রমণীর সঙ্গে তুলনা করছেন কবি যখন রাত্রিকালে অজস্র নক্ষত্র এবং একটিমাত্র চাঁদের প্রতিবিম্ব নদীবক্ষকে উদ্ভাসিত করে—

"মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় কবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে নৌকা বিলাসের পদগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে নদী এবং নৌকা রূপকের ব্যঞ্জনায় উপস্থিত, আপন আপন বস্তুগত অস্তিত্বে নয় কিন্তু মধুসূদনের কবিতায় নদীর বস্তুগত অস্তিত্ব পূর্ণভাবে স্বীকৃত। জ্ঞানদাসের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করছি[১] যার সঙ্গে মধুসূদনের কবিতায় তুলনা করলে পদাবলীর সঙ্গে মধুসূদনের কবিতার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে—

মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগণে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ॥
দেখ সখী নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিনা চঢ়িলুঁ কেনে নায়॥
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চায় মোরে।

ভয়েত কাঁপিছে যে এ জালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে।।
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি ফির হৈয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ॥"

এটা সত্য যে পদাবলীতে বাংলাদেশের প্রকৃতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ আমাদের লৌকিক কাব্যে প্রকৃতি নানাবিধ রূপক-ব্যঞ্জনায় সর্বদাই উপস্থিত ছিলো। ধর্মসাধনায় নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের সহায়তায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীচৈতন্যকে কাণ্ডারী ভেবেছেন। বিপর্যয়, কুয়াশা এবং পৃথিবীর কোলাহল যদি নদী অথবা সাগরের জলোচ্ছ্বাস বা তরঙ্গ হয় তা হলে নৌকো হবে বিশ্বাস এবং প্রেমের অবলম্বন এবং নৌকোর মাঝি হবে প্রেমিক যে দুর্যোগের পরপারে প্রেমের পাত্রীকে পৌঁছে দেবে। আবার কখনও কখনও লৌকিক জীবনে নর-নারীর জল কেলিকে অলৌকিক রসোল্লাসের উপাদান হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধন জীবনেও আমরা লক্ষ্য করেছি, শ্রীচৈতন্য সাগরের অগাধ বিস্তার এবং অতলতা দেখে দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। যাই হোক, প্রকৃতির এ হেন রূপকগত ব্যবহার পদাবলীতে সবল এবং সজীবভাবে গ্রাহ্য হয়েছিলো। মধুসূদনের কাব্যে এ ব্যবহারটি নেই। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বৈষ্ণব ধারাক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রকৃতিই যে মধুসূদনের উদ্দিষ্ট ছিলো তার প্রমাণস্বরূপ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি—

১. "কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগণে!
স্বর্ণবর্ণ-শক্র-ধনু রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর!"[১০]

২. "কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে স্মর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি !"[১১]

৩. "সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে !"[১২]

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন ছন্দ স্তবক বা verse stanza নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সমগ্র কবিতার ভাবগত ঐক্য অব্যাহত রেখে বিভিন্ন স্তবকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্রমান্বয়ে ভাবের বিস্তার এবং পরিণতি নির্মাণ করার পদ্ধতিকে ছন্দ-স্তবক বলা চলে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন।

"আমি ঠিক করেছি (অবশ্য দেবতা যদি বিরূপ না হন) অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনটি ছোটো কবিতা এবং তারপর সমিল ছন্দে আরও কিছু কবিতা লিখবো। ভেবোনা, আমি তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাতে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতালীয় ছন্দ অট্টাভা রিমার ধরনে ছন্দ-স্তবক নির্মাণ করে একটি প্রণয়-কাহিনী রচনা করা।"[১৩]

অট্টাভা রিমা (Ottava Rima) হচ্ছে আট চরণের ছন্দ-স্তবক। চরণান্তের মিল কখকখকখ গগ।[১৪] আমি চরণের আভ্যন্তরীণ ধ্বনি বিন্যাসের কথা আলোচনা করবোনা, কেননা বাংলা ভাষায় ধ্বনি স্বভাবের সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। আমি শুধু স্তবকের বহিরঙ্গগত কাঠামো এবং চরণান্তের মিলের কথা বলছি যার অনুকরণ সম্ভবপর। ইংরেজী কবিতায় এলিজাবেথীয় যুগে অট্টাভা রিমার প্রথম প্রয়োগ দেখি এডওয়ার্ড

ফেয়ার ফেক্স এর অনুবাদ কবিতায়। তিনি ইতালীয় কবি তাসোর Gerusalemme Liberata কাব্যের ইংরেজী অনুবাদে মূল ছন্দের প্রয়োগ করেন।[৫] অট্টাভা রিমার সুন্দর এবং প্রাণবন্ত প্রয়োগ পাওয়া যায় কবি কীট্‌স এর 'ইসাবেলা' কবিতায়। একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি—

"With every morn their love grew tenderer,
With every eve deeper and tenderer still ;
He might not in house, field, or garden stir,
But her full shape would all his seeing fill ;
And his continual voice was pleasanter
To her, than noise of trees on hidden rill ;
Her lute string gave an echo of his name,
She spoilt her half done broidery with the same."[১৬]

কবি বায়রনের হাতে অট্টাভা রিমা নতুন দীপ্তি, সজীবতা এবং সরস গতি পেল। তিনি আট চরণের ছন্দ স্তবকে প্রথাগত চরণান্তের মিলকে ঠিকই রাখলেন—কখ কখ কখ গগ। তাঁর 'ডন জুয়ান' কাব্য এই ছন্দ স্তবকে বিন্যস্ত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

"In France, for instance, he would write a chanson ;
In England a six canto quarto tale ;
In Spain he'd make a ballad on romance son
The last war much the same in Portugal.
In Germany, the Pegaus he'd prance on
Would be old Goethe's (see what says De Skill ;
In Italy he'd ape the 'Trecentisti.'
In Greece, he'd sing some sort of hymn like t'ye."[১৭]

এ ছন্দ-স্তবক শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ রইলো না। নতুন রূপে একে ছয় চরণের পংক্তি বন্ধনের মধ্যে পেলাম যেখানে চরণান্তের মিল হল—কখ কখ গগ। ম্যাথু আরনল্ড এর কবিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"Not by the justice that my father spurn'd
Not for the thousands whom my father slew,

Alters unfed and and temples overturn'd
Cold hearts and thankless tongues where thanks were-due;
Fell this late voice from lips that cannot lie,
Stern sentence of the powers of Destiny,"[১৮]

অট্টাভা রিমার কথা মধুসূদন উল্লেখ করেছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত ছন্দ-স্তবকের প্রয়োগ ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নেই। একমাত্র 'বংশীধ্বনি' কবিতায় ছয় চরণের ছন্দ-স্তবক পাওয়া যাচ্ছে যেখানকার চরণান্তের মিল ম্যাথু আরনল্ড-এর কবিতার মতো, যেমন—

"কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিবুঞ্জবনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে?
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?"[১৯]

অবশ্য 'ব্রজাঙ্গনা'র প্রতিটি কবিতাতেই স্পষ্ট ছন্দ-স্তবকের বিন্যাস আছে যদিও স্তবকগুলো কোনো ক্রমেই অট্টাভা রিমা নয়। মনে হয় মধুসূদন অট্টাভা রিমা ছন্দ-স্তবকে একটি প্রণয়-উপাখ্যান লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা লিখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। 'ব্রজাঙ্গনা' নিশ্চয়ই সে-কাব্য নয়।

বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সঙ্গতি রচনা করা, গতিকে স্বাভাবিক করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ কবিতার ভাব স্বরূপের ঐক্য রক্ষা করা, স্তবকগত খণ্ড খণ্ড ঐক্য নির্মাণ করে সম্পূর্ণ কবিতার মূল ঐক্যের সঙ্গে তার সাযুজ্য রক্ষা করা যে-কোনও কবি শিল্পীর লক্ষ্য হবে বলে হোরেস তাঁর 'আরস্ পোয়েটিকা'য় নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২০] কবি মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বিচিত্র ছন্দ-স্তবকের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ঐক্য নির্মাণ করেছিলেন যে-সব ঐক্য মূল কবিতার সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষা করছে।

টীকা

১. 'On the Grasshopper and Cricket নামক সনেটের প্রথম চরণ—"The poetry of earth is never dead.

২. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'কে মধুসূদন ode (ওড) বলে আখ্যাত করেছেন। পত্রটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে লিখিত—'By the bye I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her, বিরহ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভূমিকায় উদ্ধৃত]

৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত, ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাব্যের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত শ্লোকটি মধুসূদন উদ্ধৃত করেছেন। কথাটি ঠিক নয়, কেননা 'ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব মধুসূদন বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে দিয়েছিলেন। প্রকাশক হিসেবে বৈকুণ্ঠনাথ দত্তই গ্রন্থের আখ্যাপত্র এবং বিজ্ঞাপন সাজাবেন এটাই স্বাভাবিক।

৪. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভূমিকায় বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পূর্ণ 'বিজ্ঞাপন'টি উদ্ধৃত হয়েছে।

৫. মূল পত্রটি নিম্নরূপ ?

"I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ", you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of

odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon on the book is out of the press." (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

৬. "By the bye রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme?" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত।)

৭. "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja ! poor man ! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours." (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত)।

৮. 'শ্রীশ্রী পদকল্পতরু' থেকে পদাবলীর উদ্ধৃতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. 'শ্রীশ্রী পদকল্পতরু' থেকে উদ্ধৃত।

১০. "ময়ূরী"—ব্রজাঙ্গনার ৪ সংখ্যক কবিতা।

১১. 'উষা'—ব্রজাঙ্গনার ৭ সংখ্যক কবিতা।

১২. "বসন্তে"—ব্রজাঙ্গনার ১৮ সংখ্যক কবিতা।

১৩. "I have made up my mind to write Des Volente ! those short poems in Blank verse, and then do something in rhyme ; do't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian ottava Rima and write a romantic tale in it."

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত।)

১৪. ইংরেজী কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন স্বভাবের ছন্দের সংক্ষিপ্ত এবং সহজ আলোচনা পাওয়া যাবে—Enid Hamer রচিত The Metres of Englishe Poetry গ্রন্থে। প্রকাশক—Methuen & Co. Ltd, London, প্রথম প্রকাশ—১৯৩০।

১৫. Edward Farfax কর্তৃক অনূদিত কাব্যের নাম Jerusalem Delivered.

১৬. The Poetical Works of John Keats: Oxford University Press-এর The World Classics সংস্করণ ১৯৩০।

১৭. Poelical Works. Byron George Noet Gordon! London: Frowde: ১৯০৪। উদ্ধৃতি Don Juan কাব্যের তৃতীয় ক্যাণ্টো থেকে।

১৮. Poems, 1840—1876: Arnold, Matthew, With an Introduction by A. T. Quiller Couch, Oxford Frowde, ১৯০৯। উদ্ধৃতিটি Mycerinus কবিতা থেকে।

১৯. 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ১০ সংখ্যক কবিতা।

২০. লাতিন কবি হোরেসের Ars Poetica নিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যাসূত্র সহ আলোচনা পাওয়া যাবে C. O. Brink রচিত Horace on Poetry নামক গ্রন্থে। Horace on Poetry: Prolegomena to the Literary Epistles C. O. Brink: Cambridge at the University Press. 1963

বীরাঙ্গনা কাব্য

'বীরাঙ্গনা কাব্য' ভাব-রূপ, উপমা-রূপক এবং শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে মধুসূদনের পরিণত রচনা। বর্ণনাগত বিস্তারের কারণে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কখনও কখনও যে শিথিলতা দেখা যায়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে তার পরিচয় নেই। সজীব এবং সচল জীবনই এ-কাব্যের অন্তঃসার। অথচ দুঃখের বিষয়, এ কাব্যের যথাযথ বিশ্লেষণ এ-পর্যন্ত হয়নি। রূপকল্পের দিক থেকে 'ওভিদ' এর প্রভাব আছে এটাই বলা হয়েছে ; কিন্তু প্রভাবের প্রকৃতি পরীক্ষিত হয়নি। মোহিতলাল বলেছেন যে এ-কাব্যের ভাব-কল্পনা খুব গভীর নয়—কাব্য কলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনই এর একমাত্র সার্থকতা।[১] মোহিতলালের মন্তব্যের পশ্চাতে কোনও যুক্তি নেই। তিনি বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁর উক্তিকে প্রমাণিতও করেননি।

আমি বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ওভিদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব, পরে এ-কাব্যের উপমা রূপক এবং ভাব ও রূপের পরীক্ষা করব।

ইতালীয় কবি ওভিদের 'হিরইদস্' কাব্যের পত্র-রীতি অবলম্বন করে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচিত। পরিত্যক্তা রমণীর মনোবেদনা সেখানে বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে—'দিদো' লিখছে 'ইনিস'-এর কাছে, 'প্যারিস'-এর কাছে 'ইনোনী'। 'ওদিসিউস'-এর কাছে 'পেনিলোপি' ইত্যাদি। ওভিদ প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী থেকে বিভিন্ন নায়িকাকে স্মরণ করেছেন এবং তাদের বঞ্চিত হৃদয়ের হতাশ্বাসকে পত্রাকারে রূপ দিয়েছেন। 'হিরইদস্'-এ মোট একুশটি পত্র আছে—এর

মধ্যে পনেরোটি নায়িকার পত্র, বাকি ছয়টি উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে গ্রথিত নায়ক নায়িকার পত্রগুচ্ছ। এ ছয়টি পত্র ওভিদের রচনা নয় বলে অনেকে সন্দেহ করেছেন।* সন্দেহের হেতু আছে। ভাষা-ভঙ্গী এবং ছন্দরূপে শেষের ছয়টি পত্রিকার সঙ্গে প্রথম একুশটি পত্রগুচ্ছের বিরোধ আছে। যাই হোক, মধুসূদনও একুশটি পত্রই লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র এগারটি পত্র সম্পূর্ণ লিখেছেন*; অতিরিক্ত পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকাও আছে।

ওভিদের জন্ম খৃঃ পূঃ ৪৩ সালে। তাঁর পুরো নাম পুবলিউস ওভিদিউস নাসো। কবি হিসেবে ওভিদ খ্যাতি অর্জন করেন শিল্পগুণের জন্য। তাঁর কবিতা পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং মার্জিত গতির জন্যে আদৃত যে আসছে।

এখানে 'হিরইদস্'-এর কয়েকটি পত্রের সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কয়েকটি পত্রের তুলনা করা যাচ্ছে। মূলের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যই এ তুলনার প্রয়োজন।

আবেগ এবং রূপকের ব্যঞ্জনায় 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'কে—'হিরইদস্' এর দশম পত্র 'থিসিয়াসের প্রতি আরিআদ্‌নে' এর অংশ-বিশেষের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। যে ক্ষেত্রে শকুন্তলা পূর্বতন স্মৃতি-সন্ধান করে বেদনা পীড়িত হচ্ছে তার বর্ণনায় পাই ঃ

আর আর স্থল যত ;—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে
গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ ধামে!—

আরিআদ্‌নেও মিলন-শয্যার উল্লেখ করে নিবেদন করছে ঃ

saepe troum repeto, qui nos acceperat,
sed non acceptos exhibiturus erat;

et tua, quae possum pro te, vestigia tango

strataque quae membris intepuere tuis [8]

যে আরাম-কেদারা আমাদের উভয়কে একসময় গ্রহণ করেছিলো কিন্তু আর কখনও আমাদের সম্মিলিত করেনি, বার বার সে আসনের কাছে আমি ফিরে আসছি এবং তোমার পরিবর্তে স্পর্শ করছি তোমার পরিত্যক্ত শয্যা চিহ্নকে।)

স্মৃতি উদ্ধৃতিতে উভয় ক্ষেত্রেই মিলন-শয্যার উল্লেখ আছে; কিন্তু মধুসূদন 'কানন বাসর'-এর 'ফুলশয্যা'র উল্লেখ করে শকুন্তলার উক্তিকে সংস্কৃত-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেছেন, যেখানে গোপন গান্ধর্ব-বিবাহ মিলনকে সহজ করেছিলো; কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনাকে সুসহ করেনি।

এ পত্রেরই অন্যত্র স্বপ্ন সম্পাদ্য বিভ্রমের উল্লেখ আছে। অচেতন অবস্থায় শকুন্তলা দুষ্মন্তকে সামনে দেখতে পেয়েছে ভেবে হাত বাড়িয়েছে:

অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে

পদযুগ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে!

'ওভিদ' এর পত্রে আছে:

incertum vigilans a somno languida, movi

Thesea prensuras samisupina manus

mullus erat: [৫]

[অর্ধজাগরণে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, শয্যার পার্শ্ব-পরিবর্তন করে দু-বাহু প্রসারিত করে আমার থিসিয়াসকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছি; কিন্তু তাকে সেখানে পাইনি।]

. সামঞ্জস্য প্রবল; কিন্তু শকুন্তলার ঘটনাকে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের নমুনা হিসেবেও উল্লেখ করা যায়, যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে:

হরি হরি বোলি ধরণি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।

নীল গগন হেরি তোমারি ভরমভরে বিহি সঞে মাঁগয়ে পাখ॥ [৬]

অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত এহেন ভ্রান্তির উদাহরণ শকুন্তলা পত্রিকায় আরও আছে। 'পবন-স্বনন' শুনে 'মদকল করী' আশ্রমে প্রবেশ করছে, এ ভ্রান্তি

জাগছে, অথবা কুরঙ্গীর পদশব্দ দুষ্মন্তের পদশব্দের ভ্রান্তি জন্মাচ্ছে। সুতরাং ল্যাটিন কাব্যের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক আছে তা শকুন্তলার মনোবেদনার সঙ্গে পারম্পর্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এবং সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

হিরইদস্-এর কিসিয়াসের প্রতি আরিআদনে কবিতাটি আবেগগত বর্ণনার কারুকার্যে অপূর্ব। কবিতাটির বিশিষ্টতা এখানে যে আরিআদনে এখানে কাউকে অভিযুক্ত করেছে না অথবা হতাশাজনিত আক্ষেপে আর্তনাদ করছে না, সে শুধু তার নিঃসঙ্গ অবস্থার বর্ণনা করে যাচ্ছে। সমুদ্রতীর, পর্বতচূড়া এবং রুক্ষপত্রের রোমান্টিক পটভূমিকায় সম্পূর্ণ কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। মূল কবিতাটির ৭ থেকে ৩৬ চরণের একটি ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে উপস্থিত করছি :

"It was the hour when earth is glistering
With rime, and leaf-hid birds begin to sing
Scarce half awake as I lay on my side,
My drowsy hands to clasp my Theseus tried—
In vain ! I drew my hands in, tried again,
Stretching my arms to sweep the couch. In vain !
Fear shook off sleep ; I sat upright in dread
And flung myself from the deserted bed,
Beat on my breast with palms resounding deep,
And tore my hair still disarranged from sleep.
The moon is up. I search if I can spy
Aught but the shore : shore only meets my eye ;
Now here now there, I run, and all unplanned ;
My tender feet sink deep into the sand ;
And 'Theseus !' all along the beach I cry,
'Theseus !' the rocks and hollow caves reply ;
Oft as I call they call in sympathy ;

As if to aid me in my agony.
A hill there is, crowned with a fringe of trees,
Its side a cliff carved out by angry seas.
Strong in my frenzy I ascend, and sweep
With searching eyes the wide unfolded deep,
And thence for e'en the breezes are unkind—
I spy your sail flying before the wind.
Then at that sight, which never did I deserve
To see, I freeze like ice, unstrung my nerve;
Yet pain allows no rest; I spring upright!
Spring up, and 'Theseus!' shout with all my might,
'Where are you fleeing? Wicked man, turn back.
Reserve your ship for one her crew doth lack!'

(L. P. Wilkinson কৃত অনুবাদ। পুস্তকের নাম: Ovid Recalled.)

আরিআদ্‌নের পরিচয় গ্রীক পুরাণে পাওয়া যায়। আরিআদ্‌নে মিনোসও পাসিফেই-এর কন্যা। সে থিসিয়ুসের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী ছিলো এবং তার সঙ্গে দেশত্যাগ করে। তারা যখন 'দিয়া' দ্বীপে উপস্থিত হয়, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে আরিআদ্‌নে আর্তেমিসের হাতে নিহত হয়। অন্য একটি কাহিনীতে আছে যে 'দিয়া' দ্বীপে আরিআদ্‌নেকে পরিত্যাগ করে থিসিয়ুস চলে যায়।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃতি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক গতানুগতিকতার স্পর্শ রহিত। তৎকালীন বাংলা কাব্যের প্রকৃতির কল্পিত রূপবৈচিত্র্য মানব-মনের বিভিন্ন ভাব অনুভাবের প্রতিচ্ছায়া ছিলো মাত্র! কবিরা বেদনার প্রতিকায় হিসেবে পত্রপল্লবহীন নিঃসঙ্গ বৃক্ষ, নির্জন নদীতীরে জলপ্রবাহকল্লোল এবং আরও অনেক কিছু কল্পনা করেছেন। বেদনাও ছিলো 'মানসিকী' অর্থাৎ সত্যবোধ-উৎসারিত নয়, প্রকৃতিও এসেছে রীতিধর্মের সমর্থনে। মধুসূদনেই সর্বপ্রথম এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব এবং আপন অস্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপে জাগ্রত। মানুষও প্রকৃতিকে পেয়েছে আপন অস্তিত্বের বিকল্পে নয়, বরঞ্চ অস্তিত্বের সজ্ঞানতায়। শকুন্তলা-পত্রেও এর পরিচয় পাই। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সময় ক্ষেপণ করে শকুন্তলা রোদন করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'নিরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ংবদা: কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!' কিন্তু তখন নিকুঞ্জ-বনে সে বেদনা প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করেনি, বরঞ্চ— 'দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা'। প্রকৃতির এই বিরোধে তার বেদনা আরও তীব্রতা পেয়েছে এবং আশ্লিষ্ট হতাশ্বাস সত্যরূপে জাগ্রত হয়েছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দ্বিতীয় পত্র 'সোমের প্রতি তারা' কে 'হিরইদস্'-এর চতুর্থ পত্র 'হিপোলিটাস'-এর প্রতি 'ফেইড্রা'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। ঘটনা-বিন্যাসে, আক্ষেপানুরাগে, আবেগ উচ্ছ্বাসে এবং উপমা রূপকর চিত্ররূপে উভয় কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্যরকম সামঞ্জস্য; কিন্তু তবুও 'সোমের প্রতি তারা' অনন্য জীবন-নির্দেশে উজ্জ্বল। 'সোমের প্রতি তারা'য় রিরংসা এবং দেহ লিপ্সার আবেদন ন্যায়-অন্যায় এবং সামাজিক সংস্কারকে অর্থহীন করেছে এবং সর্বপ্রকার কল্যাণবোধকে নির্যাতন করে সত্য জেনেছে স্নায়ুকে। গুরুপত্নী তারা পুত্রস্থানীয় সোমকে কামনা করেছেন ন্যায় এবং সতীত্বধর্মকে বিসর্জন দিয়ে। 'ওভিদ'-এর পত্রিকায়ও একই প্রকার অন্যায় কামনার চিত্র আছে। সেখানে থিসিয়াসের পত্নী ফেইড্রা সপত্নীপুত্র হিপোলিটাসকে কামনা করছে। উভয় নারীই রিরংসাকে একমাত্র সত্য জেনেছে ধর্ম লজ্জা ভয়কে বিসর্জন দিয়ে। তারার আবেদনে পাই:

এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে;—ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে!

ফেইড্রার আবেদনে আছে:

depuduit, profugusque pudor sua signa reliquit [৭]

[আমার লজ্জা এবং সম্ভ্রমবোধ অন্তর্হিত হয়েছে।]

অন্যত্র তারা বলছে:

নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা!

ফেইড্রার উক্তিতে পাই ঃ

ista vetus pietas, aevo moritura futuro,

rustica Saturno regna tenete suit.[৮]

[এ প্রকার পুরানো ধরনের সতীত্ববোধ শনি-দেবতার যুগেও গ্রাম্য বলে ঘৃণ্য হতো। ভবিষ্যতে এর কোনো মূল্যই থাক্‌বে না।]

তারা বলছে ঃ

ক্ষম, সখে !

ফেইড্রা বল্‌ছে ঃ

Ca Veniam fassae dnraque corada dcma ![৯]

[আমার স্বীকারোক্তিকে ক্ষমা কর এবং বিগলিত কর তোর কঠিন হৃদয়কে।]

আপন মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে তারা এভাবে ঃ

পোড়ে বিরহিনী,

পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

ফেইড্রার পত্রে আছে ঃ

Venit amore graviuss, quo serius—urimurintus :

urimur, et caecum pectora vulnus habent.[১০]

[প্রেম এসেছে আমার কাছে, বিলম্বে এসেছে বলেই তা অত্যন্ত গভীর। আমি দগ্ধ হচ্ছি প্রেমে ; এ দাবানল দাহে আমার অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।]

সর্বশেষে আহত-হৃদয়ে তারা বলছে ঃ

নয়ন কাজলে

লিখিনু।

ফেইড্রার পত্রে আছে ঃ

Addimus his precibus lacrimas quoque.[১১]

[আমি এ প্রার্থনার সঙ্গে আমার চোখের পানি মিশিয়েছি।]

উল্লেখযোগ্য মিলের অভাব নেই, তবুও নিশ্চিন্তেই বলা যায় যে আন্তরিকতায় ও প্রাণ-দীপ্তিতে 'দেশের প্রতি তারা' হিরইদস্-এর ফেইড্রার পত্রের চেয়ে উজ্জ্বলতর। হিপোলিতাস ও ফেইড্রার সংবাদ আমরা গ্রীক পুরাণে পাই। থিসিয়ুসের এক পুত্রের নাম ছিলো হিপোলিতাস। থিসিয়ুস যখন ফেইড্রাকে বিয়ে করেন তখন সপত্নীপুত্র হিপোলিতাসের প্রতি ফেইড্রার আসক্তি জাগে কিন্তু হিপোলিতাস ফেইড্রার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। অপমানিত হয়ে ফেইড্রা থিসিয়ুসের কাছে হিপোলিতাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে। ওভিদ তাঁর যুগের নিয়মবদ্ধ প্রণয় লিপ্সার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় রেটোরিকের বশ্যতা আছে, সহজ এবং স্বাভাবিক জীবন-সত্যের স্মরণ নেই। কেব্‌ল্ (Kebble) তাঁর অক্সফোর্ড বক্তৃতায় ওভিদ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ঃ

> There is not a single word carrying the faintest suggestion of the ordinary everyday aspect of the sky and earth which we all know and love : unless, indeed we are to believe that Ovid, when he wrote these lines, saw in his mind's eye the sky at sunrise, with all its golden and fiery spendours.[১২]

[আমরা যে আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিদিনকার বিচিত্রতাকে জানি ও ভালবাসি, ওভিদের কোনো কাজেই তার বিন্দুমাত্র আভাসও গ্রহণ করে না যদি না আমরা ভেবে নিই যে যখন তিনি এ চরণগুলি লিখেছিলেন তখন মনশ্চক্ষুতে আকাশের সূর্যোদয়কে দেখেছিলেন তার সমস্ত স্বর্ণাভা এবং ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে।]

অন্য একজন সমালোচক লিখেছেন ঃ

> The Heroides are variations on the theme of deserted woman, imaginary letters from Dido to Aeneas, Oenone to Paris, Penelope to Ulysses, and so on. They are vigorous pretty, and not immoderate in dimension, but the very conception of such a series, such repetition

of the same motive implies the perfect detachment of feeling, the facile appeal to an indolent intelligence, which is the note of Ovidian art. They are in fact exercises in rhetoric, executed with apparent ease under conditions of difficulty,—performances merely, but as such admirable.[১৩]

অন্য এক সমালোচকের উক্তি এই :

What the Heroides lose by reason of being the portrayal of legendary characters in language removed from ordinary life they gain from their pleasant quality of style, and their constant stimulation of literary reminiscence. They should be judged on the basis of their connection rather with literature than with life.[১৪]

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তিনটি পত্রে আবেগ এবং অনুকম্পার প্রতিষ্ঠার জন্য নায়িকাগণ তাদের সন্তানের কথা উল্লেখ করছে। 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' পত্রে ক্রন্দনরত কুরু কুল শিশুর উল্লেখ আছে। 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' পত্রে দুঃশলা তার পুত্র মনিভদ্রের কল্যাণের জন্য স্বামীর প্রত্যাবর্তন কামনা করছে, 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করে শান্তনু যেন বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলতে পারে সেজন্য আবেদন আছে। 'হিরইদস'-এরও তিনটি পত্রে শিশুসন্তানকে উপস্থিত করা হয়েছে—'মাকারিউস-এর ক্যানেইস', 'জেসন এর প্রতি মিদিয়া' এবং অষ্টম পত্রে যেখানে হেলেন প্যারিসের সঙ্গে স্পার্টা ত্যাগ করলেন বলে তার শিশুকন্যা 'হারমিওনে দুঃখ প্রকাশ করছে।

নিম্নে বিক্ষিপ্তভাবে আরও কয়েকটি মিল দেখানো হলো—'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রে কেকয়ীর আক্ষেপ :

নগ্ন-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধাহীন অধর। লইল

লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !

হিরইদস-এর তৃতীয় পত্রে 'একিলিস'-এর প্রতি ব্রিসীস (Briseis) বলছে :

abiit corpusque colorque.[১৫]

[আমার দেহ সৌষ্ঠব নেই, উজ্জ্বল কান্তিও নেই।]

কেকয়ী দশরথকে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

কিন্তু পূর্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ?

হিরইদস-এর দ্বিতীয় পত্রে ফিলিস (Phyllis) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দেমোফুন (Demophoon)-কে :

iura fides ubi unc, commissaque dextera dextrae,
quique erat in falso
plurimus ore deus[১৬] ?

[যে বন্ধনে তুমি আবদ্ধ ছিলে, যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেগুলি এখন কোথায় ?]

'লক্ষ্মণের প্রতি সুর্পণখা' পত্রে সুর্পণখা বলছে :

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা।

হিরইদস্-এর তৃতীয় পত্রে একিলিস-এর প্রতি ব্রিসীস বলছে :

quascnmque adspicias, lacrimae facere lituras ;
sed tamen et lacrimae pondera vocis habent,[১৭]

[পত্রে যে সব চিহ্ন দেখছো সেগুলি অশ্রু চিহ্ন ; কিন্তু অশ্রুর গুরুত্বও শব্দের মতই।]

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' পত্রে ভানুমতী বলছে :

গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু ! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জলিল চারি দিক্ ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুল জগতে।

হিরইদস-এর পঞ্চদশ পত্রে ফৈান (Phaon)-এর প্রতি স্যাফো (Sappho) বলছে :

hic ego cum lassos posuissem flebilis artus,
constitit ante oculos Naias una meos.[১৮]

[এখানে আমি আমার ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে যখন ক্রন্দন করছি তখন আমার সম্মুখে এক দেববালা এসে দাঁড়ালো।]

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় জনা বলছে :

ফিরি কবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, 'কোথা জনা ?' বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা ?' বলি !

হিরইদস-এর দশম পত্রে থিসিয়াস (Theseus)-কে লক্ষ্য করে আরিআদনে (Ariadne) বলছে :

interea toto clamanti litore "Thesen !"
reddebant nomen concava saxa tuum,
et quotiens ego te, totients locus ipse vocabat.[১৯]

[সমুদ্রতীরে সারাক্ষণ থিসিয়াস বলে ডাকলাম, শুষ্ক পাহাড়গুলো আমার সে ডাক আমাকে ফিরিয়ে দিল।]

আরও মিল পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু সর্বত্রই সজাগ চেতনায় তা এসেছে এমন কথা বলা চলে না—অজ্ঞাতসারেও আসতে পারে।

পুরাণে 'ব্রিসীস', 'ফিলিস' এবং 'ফাওন-এর যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা এখানে উপস্থিত করছি। 'ব্রিসীস' ছিলো 'বিসিয়ুস'-এর কন্যা।

'একিলিস' 'বিসীস'কে অপহরণ করে এবং 'ব্রিসীসে'র অধিকার নিয়ে 'একিলিস' ও 'আগামেমননে'র মধ্যে বিরোধ বাধে।

'ফিলিস' ছিলো থ্রেইসের রাজা সিথনের কন্যা। দেমোফোন যখন ট্রয় থেকে গ্রীসে আসেন তখন ফিলিস তার প্রণয়ে পড়ে। দেমোফোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে এথেন্স ফিরে এসে দেমোফোনকে বিয়ে করবেন বলে কথা দেন। যখন নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ফিরলেন না তখন ফিলিস আত্মহত্যা করে এবং সে একটি বাদাম গাছে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম জীবনে 'ফাওন' নৌ-চালক ছিলো! একবার আফ্রোদিতিকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলো বলে দেবীর আশীর্বাদে সে নবীন যৌবন এবং সৌন্দর্য লাভ করে। তখন কবি সাফো তার প্রেমে পড়েন।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ যেখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যাসূত্রসহ উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে, 'বীরাঙ্গনা'য় সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। আবেগের তীব্রতায় এবং উপলব্ধির প্রগাঢ়তায় উপমান ও উপমেয় একত্রীভূত হয়েছে নির্নিমেষ শিখার মত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আবেগের বিস্তার আছে; কিন্তু বীরাঙ্গনায় ঘনীভূত আবেগের একাগ্রতা আছে। এর কারণ, মেঘনাদবধ কাব্যে' কাহিনীর দীর্ঘসূত্রিতার জন্য বিভিন্ন আবেগের উদ্ভব, প্রস্তুতি এবং বিকাশের অবসর আছে। উপরন্তু, কাহিনীটি মূলতঃ ব্যক্তি-বিশ্লিষ্ট বস্তু-কেন্দ্রিক বলেই প্রতিটি 'মোটিভ' বা ইচ্ছার বিশ্লেষণ আছে এবং এ কারণে ব্যাখ্যাসূত্রের প্রয়োজনীয়তাও আমরা অনুভব করি। ব্যাখ্যাসূত্রের প্রয়োজনীয়তার আরও একটি কারণ পাওয়া যায়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আবেগ মূলতঃ সংঘর্ষজনিত এবং সংঘর্ষকে রূপদান ও স্পষ্ট করতে হলেই বিস্তৃত উপমার প্রয়োজন হয়। বীরবাহুকে রাম আক্রমণ করলেন, যে ভাবে হর্যক্ষ আক্রমণ করে বৃষকে[২০], অথবা বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী বেষ্টন করলো, যেভাবে ব্যাধদল জাল ঘিরে সিংহকে বন্দী করে[২১], অথবা সীতাকে অশোকবনে ফেলে রেখে রাক্ষসদল উৎসব-কৌতুকে মত্ত, যে ভাবে ক্ষীণ-প্রাণা হরিণীরে ফেলে রেখে বাঘিনী নির্ভয়-হৃদয়ে দূরে বনে ঘুরে বেড়ায়[২২], অথবা গৃহমধ্যে বহ্নি জ্বললে গবাক্ষ-দুয়ার-পথে শিখাপুঞ্জ যেভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়, চতুর্দিক দিয়ে রাক্ষসদল সে ভাবেই বেরিয়ে এল[২৩]।

এ সমস্ত উপমায়, উপমান ও উপমেয়ের তুলনা এবং পারম্পরিক সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট এবং সংঘর্ষের কারণেই উপমার ব্যাখ্যাসূত্রের প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সমস্ত আবেগ প্রেম অথবা রিরংসা নিয়েই জেগে উঠেছে অর্থাৎ সংঘর্ষও যদি থাকে তবে সে সংঘর্ষের উৎস হচ্ছে হৃদয়। তাই এ কাব্যের আবেগ প্রগাঢ় এবং সংহত। সে কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপ্রেক্ষা অধিকার করেছে উপমার স্থান। ব্যাখ্যা করে হৃদয়াবেগ বা কামনার প্রতিষ্ঠা করা চলে না। তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রেমিকা তার মূর্ছাহত হৃদয়ের একটি অবস্থার কথাই বলে, যে অনুভূতি হৃদয়ে জাগে সে অনুভূতির মধ্যেই সে আপনাকে নবরূপে দেখে। উপলব্ধিকে সে ব্যাখ্যা করে না, কেননা উপলব্ধির মধ্যেই সে তন্ময়। 'তারা' তার দেহ-তৃষ্ণা ও যৌবনাবেগকে এভাবে ব্যাখ্যা করেনি, বসন্ত এলে বনরাজী যেমন বিবিধ সাজে সজ্জিত হয়, সোমকে দেখে তার যৌবনশ্রীও তেমনি পুলকিত হয়েছে। রিরংসার তীব্রতায় সে বনরাজীর সঙ্গে একাত্ম এবং সোমও সে সঙ্গে বসন্ত ঋতু। তাই সে বলছে ঃ

পাইলে মধুরে
সোহাগে বিবিধ-সাজে সাজে বনরাজী।—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

তেমনি যৌবনগত অবস্থার তীব্র বেদনায় ও ব্যর্থতায় কেকয়ী এ কথা বলছে না যে নিদাঘ যেমন কুসুমের কান্তি অপহরণ ক'রে তাকে নীরস করে তেমনি কুটিল কাল আমার যৌবন ভাণ্ডারের সমস্ত রত্ন অপহরণ করেছে। চরম হতাশ্বাসে সে কুটিল কালকে নিদাঘ থেকে এবং যৌবনকে কুসুম থেকে বিছিন্ন দেখে না। তাই উপমান ও উপমেয় তুলনারূপে প্রকাশ পায়নি, ঘনীভূত উৎপ্রেক্ষায় হতাশার আশ্লেষরূপে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

হরিল কাননে।
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে।

'শকুন্তলা' পত্রেও অনুরূপ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ হয়েছে; কিন্তু তা 'কেকয়ী' পত্রের মতো ততটা তীব্র নয়। সেখানকার ব্যর্থতাবোধ মৃদু, তাই উৎপ্রেক্ষায় বিলাস-লালিত্য এসেছে ঃ

কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল কবে কে আদরে তারে ?

'সুর্পণখা' পত্রেও দেহ-দীপাধারে কামনার শিখা জ্বালানো হয়েছে। কামনার নিশ্চিন্ত নিবেদনে সুর্পণখা লক্ষ্মণকে মোহমুগ্ধ করছে এ কথা বলে :

> আমি বিগাঢ়-যৌবনা কামরূপা। তুমি যদি মলয়রূপে এসে এ কুসুমকে গন্ধহীন পাও, তবে ফিরে যেয়ো; যদি ভ্রমররূপে এসে যৌবন ফুলে মধু না পাও, ফিরে যেয়ো। আমি আমার উচ্ছলিত যৌবন দিয়ে তোমাকে তোষণ করবো।

এখানে নিবেদনের একাগ্রতায় উপমার ব্যাখ্যাসূত্র অস্বীকৃত হয়েছে—শুধু উৎপ্রেক্ষার নিশ্চিন্ততা আছে :

আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি।
আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ রাগে! কি আর কহিব ?
মলয় ভ্রমর, দেব আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে!

'সোমের প্রতি তারা' পত্রে তারার একটিমাত্র অস্তিত্বের কথাই কবি বলেছেন। এখানকার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেহ-নিষ্ঠ কামনার নির্যাতনের মধ্যে, সর্বস্বকে কামনার বহ্ন্যুৎসবে নিবেদন করার মধ্যে। যে মুহূর্তে পাপবোধও নিঃসংশয়ে বন্ধমুক্ত হয়, এ সেই মুহূর্তের কবিতা। কবি বিভিন্ন উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে তারার মানসিক অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন ; উৎপ্রেক্ষাগুলি এই :

১ হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেমনা পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা।

২ কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ।

৩. নিত্যরাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা রাজকাজ ভুলি ?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তুণে, পুষ্পধনু হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে।

৪. পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !

৫. কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

৬. পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব কারাগারে।
এস তুমি।

৭. যাব কুঞ্জবনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে উপমারও অভাব নেই ; কিন্তু অধিকাংশ উপমাই অনুভবাত্মক—ভাবের প্রগাঢ়তায় এবং হৃদয় বেদনার বর্ণশ্রীতে উজ্জ্বল। অত্যন্ত লঘুভাবে কবি ব্যাখ্যাসূত্রকে ধরে দিয়েছেন ; কিন্তু বেশীদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেননি। উপমান উপমেয়র সম্পর্ক নির্ধারিত হয়নি ; কিন্তু সম্পর্কের নির্দেশ আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এ পঙক্তির উপমার উল্লেখ আমরা দেখেছি। যেমন ঃ

১. কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যাশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।

২. হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।

৩. কি কহিলি, বাসন্তি! পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

বীরাঙ্গনা কাব্যেও এ প্রকৃতির প্রগাঢ় উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। আমি কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেব:

১. ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত কমল দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত।

২. যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে।

৩. নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!

৪. এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেণ আসিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি!

৫. গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্ব জনে।

৬. কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?

৭. দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির আঁখি সে সূর্য্যের পানে!

উপরের সব কটি উদ্ধৃতিতেই উপমানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। উৎপ্রেক্ষায় শুধু উপমানই বিদ্যমান থাকে, উপমেয়র উল্লেখের প্রয়োজন করে না। উপরের উদ্ধৃতির উপমাগুলি উৎপ্রেক্ষার কাছাকাছি এসেছে। ব্যাখ্যা-সূত্র আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবি ব্যাখ্যাসূত্রের উপর খুব বেশী নির্ভর করেননি। উপমান এতটা উজ্জ্বল ও নিঃসংশয় যে মনে হয়, উপমেয় না থাকলেও যেন চলতো।

বীরাঙ্গনা কাব্যে জীবনের প্রকাশ অনিবার্য। প্রতিটি পত্রের আরম্ভের অন্তরঙ্গ নাটকীয় ভঙ্গী কাহিনীর মূল আবেগের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কে জড়িত করে এবং একটি সরল সংসারগত বোধ অনেক দূরের পরিবেশের অন্তরালকে উন্মোচন করে। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যে মাইকেলের যথেষ্ট জড়তা ছিল। প্রতিটি স্বর্গের আরম্ভে একটি দুর্বল সংজ্ঞা বিবৃতি বা ঘটনা-বিবৃতি উপাখ্যানের গতিকে ব্যাহত করেছে। যেমন প্রথম সর্গের ঃ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব আত্মা, ভীষণদর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল,

অথবা দ্বিতীয় সর্গের ঃ

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দগতি
অকিঞ্চন?

অথবা তৃতীয় সর্গের :

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ু, কুল-ঈশ্বর।

অথবা চতুর্থ সর্গের :

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু কান্তি আভায় যাহার
মলিন—

এ প্রকারের জড়তায় কাহিনীর গতি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কোথাও চরিত্র বা মূল সংঘর্ষের উৎসার নেই এবং আবেগের উষ্ণতা নেই। মেঘনাদবধ কাব্যেই প্রথম পরিবর্তন আসে। নাটকীয় দ্বন্দ্বে, সংঘর্ষের অভিমতে বিবৃতি সচল হয়েছে। প্রধান কাহিনীর উল্লেখ জিজ্ঞাসায় অন্বিত হয়ে উপাখ্যানকে দ্বিধামুক্ত করেছে :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ-কুলনিধি
রাঘবারি ?

অবশ্য সর্বত্র এ ভঙ্গী নেই, গতানুগতিক রীতির শিঞ্জন কখনও কখনও বক্তব্যে দ্বিধা এনেছে। দ্বিতীয় সর্গ, চতুর্থ সর্গ, পঞ্চম সর্গ, সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ এবং নবম সর্গের আরম্ভ গতানুগতিক। প্রথম, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ সর্গের আরম্ভ-জীবনগত এবং নাটকীয়। আমরা দেখব যে বীরাঙ্গনায় কবি দ্বিধামুক্ত হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের আরম্ভের উদ্ধৃতি দিয়েছি ; তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গের আরম্ভ নিম্নরূপ :

তৃতীয় সর্গ :

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।

ষষ্ঠ সর্গ ঃ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘুরাজ।

বীরাঙ্গনার ভঙ্গী আরও সজীব এবং প্রাণোজ্জ্বল। আমি দুটি মাত্র পত্রের উল্লেখ করছি—'কেকয়ী' এবং 'উর্বশী' পত্র। কেকয়ী পত্রের আরম্ভে কেকয়ীর উৎকণ্ঠা, হতাশা এবং আক্ষেপ, আকস্মিক এবং দ্রুত কয়েকটি জিজ্ঞাসায় মূর্ত হয়েছে ঃ

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?

উর্বশী পত্রের আরম্ভ আরও সুন্দর। একটি কৌতুক-উল্লেখ, আনন্দ-স্মৃতি এবং নিরাবরণ একনিষ্ঠ স্বীকারোক্তি একটি বিশেষ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জীবনকে মধুর করেছে ঃ

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা তব হেতু আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ? গুরু শিক্ষা ভুলি,

আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজ পুরূরবা প্রতি, !—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণীসহ, আর দেব যত;
চারিদিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরত ঋষি শাপ দিলা মোরে!

বীরাঙ্গনা কাব্যে বিভিন্ন পত্রের মধ্যে বাঙালী জীবনের আশ্বাস, আনন্দ, পারিবারিক বন্ধন, নিভ'রতা এবং বেদনাবৃত্তির পরিচয় আছে। মধুসূদন প্রাচীন কাব্যের এবং পুরাণের নায়িকাদের পূর্ণভাবে প্রাচীন ঐশ্বর্যের মধ্যেই রাখেননি, বাঙালী জীবনের সঙ্গে তারা বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে সম্পর্কিত হয়েছে। কল্পনার প্রসার এবং সমৃদ্ধি এই কাব্যের অলঙ্কার সন্দেহ নেই; কিন্তু সে কল্পনা কোন ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের রস-বহির্ভূ'ত নয়। প্রথম সর্গে শকুন্তলা বিভিন্ন কৃত্যে একক আকাঙ্ক্ষায় একান্তভাবে বাঙালী রমণী। তার প্রমাণ আমরা পাই সখীদের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনায় এবং আত্মবেদনায় সখীদের কাছে নিভ'রতার সন্ধানে, অথবা পিতৃস্বসা গৌতমের প্রশ্রয় কামনায় অথবা দাসীরূপে স্বামীর পদসেবার ইচ্ছা প্রকাশে। মূল 'শকুন্তলা' কাব্যে শকুন্তলা প্রকৃতি এবং আনন্দের মধ্যে জাগরিত। মধুসূদনের হাতে শকুন্তলা 'অবলা কুলের বালা' হয়েছে।

এ শুধু একটি সর্গের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, অন্যান্য সর্গেও এর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, দ্বিতীয় সর্গে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রে:

গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কিহে মনে?
হরিতকী স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বূল শয়নধামে? কুশাসন তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে?

এই উদ্ধৃতিতে অবশ্য প্রাচীন যুগ বর্তমান সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে।

তৃতীয় সর্গের রুক্মিনীও 'অবলা কুলের বালা', যদিও মহাভারতে রুক্মিনী বীরাঙ্গনা এবং লক্ষ্মী অবতার।

পঞ্চম সর্গে রাক্ষস-কন্যা সূর্পণখা লক্ষ্মণের

বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি।

এভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা বলতে পারি যে একাব্যে প্রাচীন পুরাণের দেবকল্প নরনারী নরকল্পতা পেয়েছে। উজ্জ্বল রঙ্গাভরণ, শোভা এবং সৌন্দর্য সত্ত্বেও তারা বাঙালী জীবনের অভীপ্সা এবং আনন্দ নিয়ে লৌকিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি এবং স্নিগ্ধতা ঘোষণা করেছে।

টীকা

১ মোহিতলাল : কবি শ্রীমধুসূদন, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮।

Marcus Southwell Dimsdale : A History of Latin Literature, Heinemann, 1915, Page 320. অবশ্য L. P. Wilkinson সব কটি পত্রই ওভিদ-এর রচিত বলে মনে করেন। (Ovid Recalled : L. P. Wilkinson, Cambrdge University Press, 1955).

৩ "Thera are to be twenty one Epistles, and I have finished eleven."

রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্র, বীরাঙ্গনা কাব্য, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ (মাঘ, ১৩৬২, পৃঃ।৵০)

৪ Grant Showerman কৃত ইংরেজী অনুবাদ : (Ovid : Heroides and Amores—Loeb edition, 1921).

"Oft do I come again to the couch that once received us both, but was fated never to show us together again, and touch the imprint left by you—'tis all I can in place of you."

৫ "Half waking only, languid from sleep, I turned upon my side and put forth hands to clasp my Theseus—he was not there."

৬ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী-পরিচয়, পৃঃ ১০৭।

৭ "My modesty has fled, and as it fled it left its standards behind."

৮ "Such old fashioned regard for virtue was rustic even in Saturn's reign, and doomed to die in the age to come."

৯ "Forgive me my confession, and soften your hard heart."

১০ "Love has come to me, the deeper for its coming late—I am burning with love within ; I am burning and my breast has an unseen wound."

১১ "I mingle with these prayers, my tears as well."

১২. Keble : Lectures on Poetry, Vol. II, Oxford, পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

১৩ John Sandys ; A Companion to Latin Literature, Cambridge, ১৯১০, পৃঃ ৬২৮।

১৪ Grant Showerman : In Appreciation of the Horoides, পৃঃ ৮ ৯।

১৫ "Gone is my flesh, and gone my colour."

১৬ "The bonds that should hold you, the faith that you swore ; where are they now ?"

১৭ "Whatever blots you shall see, her tears have made ; but tears, too, have none the less, the weight of words."

১৮ "Here I had laid my wearied limbs and given way to tears when there stood before my eyes a Naiad."

১৯ "And all the while I cried out, 'Theseus!' along the entire shore and the hollow rocks sent back your name to me."

২০ অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে।

মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম সর্গ, পৃঃ ৩৪, ১০৬-১৬৮ চরণান্তর্গত
[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

২১ শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী,
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা।

ঐ—১/৩৭/২৩৮—২৬৪

২২ দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—

হীণাপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।

ঐ—৪/১০৭/৩৫—৫৭

২৩ যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে
গবাক্ষ দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে।

ঐ—৭/২০০/৪৮২—৫০৯

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' একটি বিশেষ কালে এবং সময়ের পটভূমিকায় মধুসূদনের জীবন-ভাষ্য—জীবনের বহিরঙ্গগত বা জীবনযাপনগত ভাষ্য নয় কিন্তু একটি বিশেষ সময়ের অন্তরঙ্গ চিত্ত-স্বরূপের উদ্‌ঘাটন।[১] 'উপক্রম' কবিতাটিতে কবি আপন পূর্বতন কবি-কৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যেমন যৌবনকালের কাব্যপ্রয়াস 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'কে কবি মুক্তাসদৃশ বলছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বলছেন গম্ভীর সুর-ঝঙ্কার, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'কে বলছেন কল্পনায় ব্রজধামের কাহিনী নির্মাণ, এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য'কে বলছেন বিরহ-লেখন। এভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে বলতে পারি 'প্রদীপ্ত মুহূর্তের জীবনভাষ্য'।[২]

একজন কবির জন্য প্রদীপ্ত মুহূর্ত তাকেই বলব যে মুহূর্তে তাঁর জীবনের কোনও একটি অভিজ্ঞতা অকস্মাৎ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং স্মৃতিতে ভাস্বর হয়। কবি চিত্ররূপে এবং ধ্বনিরূপে তাঁর প্রদীপ্ত মুহূর্তকে জাজ্বল্যমান করেন। কখনও অধীত কাব্যের চিত্রকল্পগুলো স্মৃতিতে বিকশিত হয়। কখনও উপস্থিত মুহূর্তের বিকলতার কারণে অতীতের কোনও নির্ভরযোগ্য মুহূর্ত কান্নারূপে উদ্ভাসিত হয়। কখনও শৈশবের উন্মোচন, কখনও শান্তি ও নির্জনতার নিশ্চিন্ততা। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদন এ ভাবেই তাঁর জীবনের অনেক প্রদীপ্ত মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছেন।

অধীত কাব্যের চিত্রকল্প পাই 'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'মেঘদূত', 'মহাভারত', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'সুভদ্রা-হরণ', 'কিরাত-আর্জুনীয়ম্', 'গোগৃহ-রণে', 'কুরুক্ষেত্রে', 'সুভদ্রা', 'উর্বশী', 'দুঃশাসন', 'হিড়িম্বা', 'পুরুরবা', 'শিশুপাল', 'রামায়ণ', 'হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু', 'শকুন্তলা' ও 'শ্রীমন্তের টোপর'

কবিতাগুলোতে।[৩] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যপাঠের স্মৃতি ধরা পড়েছে 'কমলে কামিনী' এবং 'শ্রীমন্তের টোপর' কবিতা দুটিতে। কালিদহে বালক শ্রীমন্ত যখন কমলে কামিনীকে দেখলো শ্রীমন্তের দৃষ্টির সে-মুহূর্তের বিস্ময়কে কবি এখানে চির-স্বাক্ষরিত করেছেন। কবি বলছেন, তিনি স্বপ্নে কালীদহে কমলে কামিনীকে দেখলেন। রাত্রিকালে জলাশয়ে চাঁদের মধুর প্রতিবিম্বের মতো দেবী বসে আছেন শতদলের মধ্যে এবং

"বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।"[৪]

উপরের উদ্ধৃতিতে একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট রেখাঙ্কনে একটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং জলকল্লোলকে কবি শ্রবণগ্রাহ্য করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দুবার কমলে কামিনীর দর্শন পাওয়া যায় – একবার ধনপতি সিংহল যাত্রার পথে কালীদহে পদ্মের উদ্যানে কমলাসনে অপরূপ রূপবতীকে দেখলেন যিনি বামহাতে গজরাজকে ধরে তাকে গ্রাস করছেন অন্যবার তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে দুর্গম সমুদ্র-যাত্রায় কালীদহে কমলে কামিনীকে দেখলো। পিতা কমলে কামিনীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু সিংহলের রাজসভায় কেউ এ-কাহিনী বিশ্বাস করলো না। প্রমাণের জন্য তাঁকে বন্দী করে আনা হল কালীদহে কিন্তু এবার কমলে কামিনী দেখা গেলো না। ধনপতি সিংহলের কারাগারে বন্দী রইলেন। পুত্র শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর কৃপায় পিতাকে মুক্ত করে।

'শ্রীমন্তের টোপর' কবিতায় এর পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ দেখে বণিকপুত্র শ্রীমন্ত কালীদহে এসে কমলে কামিনীকে দেখলো। তারপর সে গেলো পিতার সন্ধানে সিংহলে। বাধা পেল সে শহর কোটালের কাছে। শ্রীমন্তের মাথায় ছিলো লক্ষ টাকা মূল্যের রত্নখচিত টোপর। কোটাল বললো, "তুমি যদি যথার্থ সাধু হও, তবে অকাতরে তোমার দামী টোপরটি জলে ফেলে দাও দেখি।" শ্রীমন্ত টোপর ফেলে দিলো, কিন্তু অন্তরীক্ষে চণ্ডী তা দেখতে

পেলেন। তিনি টোপরটি গ্রহণ করলেন এবং তা শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনার কাছে পৌঁছে দিলেন। সমগ্র ঘটনাটি মধুসূদনের কবিতায় অপূর্ব-শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। রত্নখচিত টোপরটি যখন সমুদ্রে পড়ছে তখনকার দৃশ্যকে মধুসূদন তুলনা করছেন স্বচ্ছসরোবরে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে মাছ-রাঙার গতিবিধির সঙ্গে। একই সঙ্গে নিক্ষিপ্ত টোপরের ঔজ্জ্বল্য এবং গতি এ-উপমায় ধরা পড়েছে ঃ

"হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনু-সম দীপ্ত বিধির বরণে)
পড়িল মুকুট উঠি, অকুল সাগরে,
উজলি চৌদিকে শত রতনের করে
দ্রুতগতি।"[৫]

কবিতাটির শেষে অন্য একটি উপমা এসেছে—কেমন করে বাজপাখী মাছরাঙাকে ধরে, তেমনিভাবে ক্ষেমঙ্করী রূপ ধারণ করে দেবী টোপরটি ধরলেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পাঠের স্মৃতি বহন করছে দুটি কবিতা—'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' এবং 'ঈশ্বরী পাটনী'। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতাটি সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম বাণী-বিন্যাসের একটি সুন্দর নিদর্শন। একটি নিগূঢ় বক্তব্যকে উচ্ছ্বাসবিহীন সরল এবং নিশ্চিন্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবান করা হয়েছে। মোহিনীমূর্তি ধারণ করে কাঁখে ঝাঁপি নিয়ে ভবানন্দের গৃহে প্রবেশ করছেন দেবী অন্নদা। শূন্যে সঙ্গীত—স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে এবং অদৃশ্য থেকে নৃত্য করছে অপ্সরাকুল। দেবীর প্রসাদে ভবানন্দ নিশ্চয়ই রাজাসন ও রাজছত্র পাবেন, প্রভূত সম্পদের অধিকারী হবেন তিনি। কিন্তু সংসারে ঐশ্বর্য তো চিরস্থায়ী নয়। ভবানন্দকে যা অমর করবে তা হচ্ছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য যেখানে তাঁর বংশের যশঃকীর্তি বাঙালীর স্মৃতিতে চির-স্বাক্ষরিত থাকবে।

'ঈশ্বরী পাটনী' কবিতায় কবি একজন অন্নপ্রাণ, নিরোভ, দরিদ্র ব্যক্তির সৌভাগ্যের কথা বলছেন। ঈশ্বরী পাটনীর খেয়াপারের নৌকোয় বসেছেন মানবীবেশে দেবী অন্নপূর্ণা যার পদস্পর্শে কাঠের সেঁউতি স্বর্ণময় হয়েছে। কবি বলছেন, পাটনী যেন এ-সুযোগ হেলায় না হারায়, দেবীর কাছ থেকে সে যেন ঐশ্বর্য চেয়ে নেয়। এ-দুটি কবিতায় কবি তাঁর তৎকালীন আর্থিক অস্বচ্ছলতার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যশোলাভের ক্ষেত্রে অবিনশ্বরতার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেছেন। কবিতা দুটিতে সূক্ষ্ম বেদনা-প্রবাহ অন্তর্লীন রয়েছে। কাব্যক্ষেত্রে চির-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যাকুল কবি সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে কালযাপন করছেন। একমাত্র অবলম্বন তাঁর স্মৃতিগত দেশজচৈতন্য। তারই পসরা সাজিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীরূপে যে উপঢৌকন দিলেন দেশ এবং জাতিকে তার মধ্যে কবির অন্তরাত্মার ক্রন্দন চিরদিন ধ্বনিত থাকবে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মহাভারত[৬] পাঠের বহু স্মৃতি চিহ্নিত রয়েছে। কবি কাশীরাম দাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কেননা কাশীরাম দাস সংস্কৃত থেকে গৌড়জনের বোধ্য বাংলা ভাষায় মহাভারতের কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন। যেমন মহাদেবের জটাজালে একসময় আবদ্ধ ছিলো যে জাহ্নবী, কঠোর তপঃসাধনায় ভগীরথ তাকে মুক্ত করে প্রবহমান করলেন। তেমনি দ্বৈপায়ন কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় নিরুদ্ধ গতি ছিলো যে মহাভারতের তাকে বঙ্গভাষার স্রোতোধারায় প্রবাহিত করলেন কাশীরাম দাস—

"সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।"[৭]

'মহাভারত' কবিতায় কবি বলছেন দ্বৈপায়ন ঋষির গম্ভীর ধ্বনিমাধুর্য সম্বলিত কাহিনী পাঠ করে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং দৃষ্টিতে ভাসছে দেখছেন দুর্যোধনের বলবিক্রম, কর্ণের তেজস্বী মূর্তি, অর্জুনের নক্ষত্রের মতো

রূপাভিব্যক্তি। কবি এক্ষেত্রে 'উন্মীলি নয়ন' কথাটি ব্যবহার করেছেন। মূলতঃ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' দৃষ্টির তাৎপর্যে অসাধারণ মূল্যবান। কবি নয়নের দ্বারা বস্তুর রূপ নির্ণয় করে তাকে শোভমান ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন। স্মৃতির সঞ্চয়গুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে মমতা ও বেদনায় কবির প্রবাসী জীবনে শুভনিজিত্ত নির্মাণ করেছে। আরও স্পষ্টভাবে 'নন্দন-কানন' কবিতায় কবি বলছেন, ''আঁখি দিয়া দেখি তব বনে ভাব পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।''

মহাভারতের অন্য একটি কাহিনী-পাঠের স্মৃতিতে 'সুভদ্রা-হরণ' কবিতাটি রচিত। কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি হতাশা-জনিত অভিমান বেদনাবৃত্তিতে কীর্তিত হয়েছে। কবি ভেবেছিলেন তিনি বাংলা ভাষায় সুভদ্রার অপহরণ কাহিনী নতুন সুরঝঙ্কারে রচনা করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রেরণা হারিয়েছেন যেমন করে গ্রীষ্মকালে জলরাশি শুকিয়ে যায়। রাত্রিকালে শিশিরে যদি পুষ্পকলি নিষিক্ত না হয়। তাহলে পুষ্পরূপে তা বিকশিত হতে পারে না। ঘৃতাহুতি না পেলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। কবির দূরদৃষ্ট যে তিনি নিঃস্ব ও অসহায়। ভবিষ্যতে হয়তো কোনও ভাগ্যবান কবি এ-কাহিনী রচনার প্রেরণা পাবেন যিনি বিজ্ঞজনকে তুষ্ট করে সুযশ লাভ করবেন।

'গোগৃহ-রণে' কবিতাটি মহাভারতের বিরাটপর্বের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অর্জুন যখন চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছেন তখন তিনি, যেমন শরৎকালের সূর্য দীপ্ত মধ্যাহ্নে প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করে তেমনি রণস্থলে অনবরত বাণবৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রাণভয়ে শঙ্কিত হয়ে দুর্যোধন সমরভূমি পরিত্যাগ করে অর্জুনশূন্য প্রদেশে গমন করতে উদ্যত হলেন। মধুসূদনের কবিতাটি বিশিষ্ট কোনও তাৎপর্যবহ না হলেও বীররসের প্রতি কবির স্বভাবজ আকর্ষণ এখানে স্পষ্ট হয়।[৮] অবশ্য মহাভারতের অনিন্দ্যসুন্দর উপমাগুলো মধুসূদনের কবিতায় অনুপস্থিত। মহাভারতে আছে, অর্জুন গাণ্ডীবে সূর্যসঙ্কাশ অস্ত্র সংযোজন করলেন এবং সে-অস্ত্র থেকে আদিত্যের ন্যায় অংশুমালা বিনির্গত হতে লাগলো। গাণ্ডীব-শরাসন মেঘমালা-বিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়, পর্বতবিকীর্ণ হুতাশনের

ন্যায় এবং অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পেতে লাগলো। মধুসূদনের উপমা এ-তুলনায় নিষ্প্রভ হয়েও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ঃ

'হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি।
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি।
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
সুরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি।
শোভে অম্লানে নভে।''[৯]

অপূর্ব কৌশলে মধুসূদন আভ্যন্তরীণ অনুপ্রাসের সাহায্যে একটি সাম্য নির্মাণ করেছেন যা শ্রুতিসুখকর আনন্দদীপ্ত। মহাভারতের উপমা তাঁর কবিতায় ধরা পড়েনি সত্য, কিন্তু উপমার অভাব তিনি দূর করেছেন স্বর-বৈচিত্র্য এবং অনুপ্রয়াসের দ্বারা।

'কুরুক্ষেত্র' কবিতাটি মহাভারতের দ্রোণপর্বের একটি ঘটনাগত আবেগের পুনর্নির্মাণ। অর্জুনতনয় রথযুথপতি অভিমন্যুর মৃত্যু উপলক্ষ করে কবিতাটি রচিত। মহাভারতকার মৃত অভিমন্যুর তুলনা করেছেন— দাহদহনান্তর নিদাঘকালীন প্রশান্ত পাবকের সঙ্গে। আদিত্যের সঙ্গে, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের সঙ্গে, হব্যবিহীন যজ্ঞীয় হুতাশনের সঙ্গে। মধুসূদনের কবিতায় এ-উপমাগুলো নেই। তিনি অভিমন্যুর সর্বশেষ পরাক্রমের উল্লেখ করে একটি বিষাদান্ত অথচ বীরের কাম্য মৃত্যুর চিত্র অঙ্কন করেছেন অনিবার্য নিশ্চিন্ততায়—

"আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।''[১০]

'সুভদ্রা' কবিতাটিতে অর্জুন এবং সুভদ্রার প্রণয়ের রসাভাষ চিত্রিত হয়েছে। মহাভারতে অর্জুনের পত্নী হিসাবে এবং অভিমন্যুর জননী

হিসেবে সুভদ্রা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। কবি মধুসূদন কাম্য বরাঙ্গনারূপে সুভদ্রাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

মহাভারতের কর্ণপর্বের একটি ঘটনা অবলম্বন করে 'দুঃশাসন' কবিতাটি লিখিত। দুঃশাসন পাণ্ডবদের প্রতি যে যে প্রকারে শত্রুতা করেছিলো এবং পতিপরায়ণা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রাপহরণ করেছিলো সে-সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা স্মৃতিপথে জাগ্রত রেখে মহাবলশালী ভীম দুঃশাসনকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন। নিহত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে ভীমসেন তার শোণিত পান করেন। এ-অংশের বর্ণনা মধুসূদনের কবিতায় নিম্নরূপ ঃ

"বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
'মানাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্বরঃ পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি'।"১

মূল মহাভারতে আছে, রক্তপাত করে ভীমসেন বললেন, 'মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ থেকে উৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যেসব অমৃতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শত্রুশোণিত সে-সব চেয়েও সুস্বাদু মনে হল।' সর্বশেষে উপহাসাচ্ছলে তিনি বললেন, 'হে দুঃশাসন! এখন মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে, আর আমি তোমার কিছুই করতে পারবো না।'

কবি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নিয়েছেন 'হিড়িম্বা'র উপাখ্যান। ভীমের পত্নী হিড়িম্বা ভীমের মতই শক্তিধারিণী। কবি ৬৩ ও ৬৪ সংখ্যক দুটি কবিতায় হিড়িম্বাকে পরিচিত করিয়েছেন। প্রথম কবিতায় ভীমের প্রণয়ে মুগ্ধা হিড়িম্বা, দ্বিতীয় কবিতায় ভ্রাতা হিড়িম্ব-র কাছ থেকে রক্ষা পাবার বাসনায় ভীমের পদপ্রান্তে আশ্রিতা হিড়িম্বা। কবি এ-দুটি কবিতার মাধ্যমে হিড়িম্বাকে একই সঙ্গে বীরজায়া, প্রণয়িণী

এবং আশ্রিতা রমণীরূপে অঙ্কন করেছেন। উভয় কবিতার মধ্যে দ্বিতীয়টি তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ এবং তাৎপর্যহীন।

'হস্তিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু' কবিতাটিও মহাভারতের স্মৃতি বহন করছে। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দ্রৌপদীর চিত্তে গুপ্তভাবে প্রণয়-গত তারতম্য ছিলো বলে সেখানে দ্রৌপদীর অধঃপতন চিত্রিত হয়েছে। মধুসূদন দ্রৌপদীর চিত্র অঙ্কন করেছেন অশেষ মমতার সঙ্গে :

"নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে,
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!"[১২]

যেমন মহাভারত পাঠের পরিচয় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেকগুলি কবিতায় চিহ্নিত রয়েছে, তেমনি রামায়ণ পাঠের স্মৃতি বহন করছে কয়েকটি কবিতা, যেমন, 'কৃত্তিবাস', 'সীতার বনবাস', 'রামায়ণ' এবং 'বাল্মীকি'। 'কৃত্তিবাস' কবিতায় কবি কৃত্তিবাসের গুণকীর্তন করেছেন এবং এই গুণকীর্তন সূত্রে বলেছেন যে,

> যেমন হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে রামের কানে সীতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন তেমনি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বাল্মীকির বার্তা।[১৩]

কবিতাটি আবেগগত সৌন্দর্যে মধুর এবং দীপ্তিময়। অল্প পরিসরের এই কবিতাটিতে কৃত্তিবাসের যে পরিচয় কবি উপস্থিত করেছেন, কৃত্তিবাস সম্পর্কে সেটাই বাংলা-সাহিত্যেরও চরম কথা। যার জীবনের মহা-মূল্যবান কৃতি হচ্ছে রামায়ণ তিনি যথার্থ কীর্তিমান। সুতরাং কবির বিবেচনায় কৃত্তিবাস নামটি সার্থক।

'সীতাদেবী' কবিতাটি রামায়ণের অশোকবনে সীতার কথা আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক করে। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' অপরিসীম মমতার সঙ্গে সীতার বন্দিনী দশার কথা বর্ণনা করেছেন।[১৪] এই কবিতায়ও সেই মমতা সমভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। মনে হয়, মধুসূদন সীতার এই

অন্যতম সৌন্দর্যে সুন্দর বলে ভাবতেন। চিত্রকলার দিক থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে অশোকবনে সীতা একটি চিত্রের রেখাঙ্কন এবং বর্ণবিন্যাসে যতটা সুন্দরভাবে চিত্রিত হবে অন্য কোনভাবে ততটা হবে না। মধুসূদনের চিত্রধর্মিতা অথবা বলা যায় দৃষ্টিতে উপলব্ধিকে স্মরণীয় করার ক্ষমতা সীতা চরিত্রের পরিচয়সূত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং আলোচ্য গ্রন্থের 'সীতাদেবী' ও 'সীতা বনবাসে' কবিতা দুটিতে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে।

'সীতা-বনবাসে' শীর্ষক দুটি কবিতায় (৪৯ এবং ৫০ সংখ্যক) বনবাসিনী সীতার অচলাবস্থা দুঃখ এবং আর্তরোদনকে কবি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে বাঙ্ময় করেছেন। মহাভারতের ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতাগুলিতে যেভাবে মহাভারতের প্রতিবিম্ব পড়েছে রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলিতে সেভাবে কিন্তু রামায়ণের প্রতিবিম্ব পড়েনি! কেননা, এ কবিতাগুলিতে কবি কোন বিশেষ ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে বিশেষ অবস্থার বিপাকে সীতাচিত্তে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছে সেই প্রতিক্রিয়াকে একটি আবেগের আবৃত্তিতে প্রবহমান করেছেন।

'রামায়ণ' কবিতাটি কবির আত্মবিবরণ। তিনি এ কবিতায় তাঁর জীবনে রামায়ণের প্রভাবের পরিচয় উপস্থিত করেছেন। কবি বলছেন, স্বপ্নে তিনি বাল্মীকির দর্শন পেলেন। বাল্মীকি বীণা হাতে করে রামায়ণ গান করছিলেন; সেই রামায়ণ গান শুনে কবির চিত্ত দ্রবীভূত হল, বিশেষ করে বৈদেহীর বেদনায় আর্দ্র হল তাঁর মন। বৈদেহীর রূপবর্ণনায় সূত্রে কবি তাকে বলেছেন, 'নিত্য-কান্তি কমলিনী'। কবিতাটির শেষে কবি 'মেঘনাদবধের' উল্লেখ করেছেন। 'বাল্মীকি' কবিতাটি মূলতঃ বাল্মীকি প্রশস্তি। বাল্মীকি একসময় দস্যু ছিলেন, পরে ব্রহ্মার বরে কবি হিসেবে খ্যাত হলেন। এই তথ্যটুকু অবলম্বন করে কবিতাটি রচিত হয়েছে।

মহাভারত এবং রামায়ণ ছাড়া অন্য যে সমস্ত কাব্যপাঠের স্মৃতি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বহন করছে, তা হচ্ছে, মহাকবি ভারবি রচিত নাট্যকাব্য 'কিরাত আর্জুনীয়ম', মাঘ রচিত 'শিশুপাল বধ কাব্য' এবং কালিদাস রচিত 'বিক্রমোর্বশী নাটক', 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা'।

ভারবির নামের উল্লেখ বিজাপুর জেলার অইহোড় নামক একটি অঞ্চলে ৬৩৪ খৃঃ উৎকীর্ণ একটি শিলায় দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, ইনি দক্ষিণাপথের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কনিষ্ঠভ্রাতা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সভাকবি ছিলেন। ইনি দণ্ডীর প্রপিতামহ দামোদরের মিত্র ছিলেন। ভারবির একটিমাত্র কাব্য আমরা পেয়েছি—১৮ সর্গে রচিত 'কিরাতআর্জ্জুনীয়ম্'।[১৫]

'শিশুপাল' কবিতাটি মাঘ রচিত 'শিশুপাল বধ' কাব্য পাঠের স্মৃতি বহন করছে। মাঘ সম্ভবত ৬১৪ বছর জীবিত ছিলেন। মাঘ কোন যথার্থ নাম না উপাধি তা আমরা জানি না। ইনি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পিতামহ সুপ্রভদেব রাজা ধর্মনাভের মন্ত্রী ছিলেন। মাঘের একটি মাত্র কাব্যের কথাই আমরা জানি, সেটি শিশুপালবধ কাব্য।[১৬] কবি কালিদাসের কাব্যপাঠের স্মৃতি বহন করছে পাঁচটি কবিতা—' 'কালিদাস', 'মেঘদূত', 'উর্বশী', 'পুরুরবা' ও 'শকুন্তলা'। কবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি ছিলেন। তিনি গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন।[১৭] বিক্রমাদিত্যের সময়কাল ছিল ৩১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪৪১ খৃষ্টাব্দ। মধুসূদন তাঁর স্মৃতিতে যে কটি কাব্যের পরিচয় এনেছেন তা হল, 'মেঘদূত' কাব্য ও শকুন্তলা' 'বিক্রমোবর্শী' নাটক। মধুসূদন কালিদাসকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বন্দনা করেছেন। কবি বলেছেন যে, কালিদাসের কবিতা এত মধুর যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, সরস্বতী তার স্বর্ণবীণা তাঁকে অর্পণ করেছিলেন।

অধীত কাব্যের চিত্রকল্প 'চতুর্দর্শপদী কবিতাবলী'কে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রধানত যে কারণে এই কাব্যগ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা হচ্ছে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে এই কাব্যগ্রন্থেই আমরা সর্বপ্রথম কবির অন্তরঙ্গ এবং একান্ত আপন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বিদেশে বান্ধবহীন অবস্থায় অর্থনৈতিক হতাশায় কবি যখন বিপর্যস্ত সে সময় এই কবিতাগুলির মাধ্যমে কবি তাঁর দেশের সঙ্গে এবং আপন স্মৃতির সঙ্গে কথা বলেছেন। অধিকন্তু, অনেকগুলি কবিতা মাতৃভূমি প্রীতির অপূর্ব নিদর্শন বহন করছে। এখানকার দেশপ্রেমের

মধ্যে রাজনীতি নেই, জাতিবৈর নেই, কিন্তু একটি সুদুর্লভ মহিমান্বিত নিবেদিত চিত্তের অর্ঘ্যপ্রদান আছে। তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যেই যে এই কবিতাগুলি দুর্লভ তাই নয়, মধুসূদনের পরেও আর কোন কবি এত মমতার সঙ্গে এবং আপন সর্বস্ব দিয়ে স্বদেশ এবং স্বভাষাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেননি। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবির সমগ্রজীবন যেন একটি একাগ্র বিনয়ে দেশ ও ভাষার প্রতি নিবেদিত হয়েছে। 'কপোতাক্ষ নদ', 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বউ কথা কও', 'শ্মশান, 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরলক্ষ্মীপূজা' 'শ্রীপঞ্চমী' ইত্যাদি কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি মাতৃভূমির কত সাধারণ বস্তুর অনুপম স্মৃতি কবি-কল্পনাকে সঞ্জীবিত করেছে। কবির চতুর্দিকে যখন অন্য ভাষার উচ্চারণ এবং অপরিচিত জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তার সে সময় আত্মনিমগ্ন কবি আপন জীবনের সত্যস্বরূপকে আবিষ্কার করেছেন 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলীর মধ্যে।

তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন বিদেশী সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর ঐকান্তিক প্রবণতা ছিলো ইউরোপীয় সভ্যতাকে একান্তভাবে নিজস্ব করা, অথচ কি বিস্ময় তিনি সৃষ্টি করছেন আমাদের জন্য। বিদেশে অপরিচিত কলকল্লোলের মধ্যে তিনি একাকী নির্জন পথযাত্রী হয়ে আপন দেশ ও মাতৃভাষাকে আবিষ্কার করলেন। এ আবিষ্কারের তুলনা হয় না।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটিতে কবি তাঁর মাতৃভূমির একটি নদীর কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত করেছেন। তিনি শব্দ ব্যবহারের কুশলতায় নদীর কলকল্লোলকেও কবিতাটির মধ্যে তুলে ধরেছেন। স্মৃতিতে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় আবার শ্রবণসাধ্যও হয়। এই কবিতাটিতে নদীর চিত্র তিনি এঁকেছেন তার জলপ্রবাহের ধ্বনিতরঙ্গকে শব্দে সার্থকভাবে পরিস্রোতমান করে। পর পর প্রথম তিনটি চরণের আরম্ভে 'সতত' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি তরঙ্গবিরল শান্ত নদীর প্রবাহের কলগুঞ্জন শুনতে পাই। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন

যে, নদীর স্রোতপ্রবাহের ধ্বনিতরঙ্গ শব্দে যে কি ভাবে ধরা পড়েছে তার একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে :

'যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি।':৮

পাঠ করলেই অনুভূত হবে যে ধ্বনির একটা বিলম্বিত শান্ত লয় আছে। 'জ' এবং 'র'-এর অনুপ্রাস এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপস্থিতি এতে একটি প্রবহমান শান্ত মন্থরতা দান করেছে। 'বটবৃক্ষ' কবিতাটির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। কবি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং পত্রপুঞ্জ যে ছায়া বিছায় তার শীতলতার কথা স্মরণ করেছেন। কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শীতলতাকে আমাদের শরীর দিয়ে অনুভব করি যেন। গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে যখন সূর্যের দাবদাহ তখন বটবৃক্ষের ছায়াঞ্চল একটি নিভৃতলোকের বিশ্রাম। অতি অল্পকথায় যেভাবে কবি এই ছায়াঞ্চলের স্বাদ এবং অনুভূতি শব্দে সমর্পণ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। আর একটি কবিতা এরই সগোত্র। কবিতাটির নাম 'নিশাকালে নদীরতীরে বটবৃক্ষতলে শিব মন্দির'। এই কবিতাটিতেও মূল লক্ষ্য বটবৃক্ষ। কবি বটবৃক্ষকে জীর্ণ পরিত্যক্ত মন্দিরের আচার্যরূপে কল্পনা করছেন—'আচার্যরূপে এই তরুপতি উচ্চারিছে বীজমন্ত্র'। কবি তাঁর জন্মভূমির প্রতীক হিসেবে বটবৃক্ষকে গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। যারা বাংলাদেশকে জানেন, এবং এর গ্রামাঞ্চলের বিস্তার এবং নদীর প্রবাহ প্রতিনিয়ত দেখেছেন তারাই স্বীকার করবেন যে, বটবৃক্ষগুলি আমাদের গ্রামের জীবনের সঙ্গে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বটবৃক্ষ-ছায়া আমাদের গ্রামের জীবনের একটি আশ্রয় কেন্দ্র এবং বিশ্রামের আমন্ত্রণের মত। মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি কল্পনা করে কোন দৃশ্য নির্মাণ করেননি, আমাদের জীবনের যে দৃশ্যগুলো সব সময়ের জন্য সত্য সে সব দৃশ্যের তিনি পট উন্মোচন করেছেন। তাঁর মানসলোকের স্মৃতিতে এ দৃশ্যগুলো তাঁকে জীবন দিয়েছে এবং বিদেশে অপরিচিত পরিমণ্ডলে এ স্মৃতিগুলো ছিল তাঁর

কাছে আত্মস্বরূপ। যে দৃশ্যগুলো আমরা প্রতিদিন দেখি অথচ আমাদের স্মৃতিতে চিহ্নিত থাকে না, মধুসূদনের নতুন রূপায়ণে তা আমাদের দৃষ্টিতে এবং জীবনে অবিনশ্বর তাৎপর্য পায়। কবি বলেছেন রাজসূয় যজ্ঞের রত্নমুকুট পরিধান করে রাজবর্গ যখন আসেন। এ দৃশ্য সুন্দর কিন্তু রাত্রিকালে অসংখ্য জোনাকী যেন প্রদীপ জ্বালিয়ে যখন জীর্ণ মন্দিরের চতুর্দিকে আলোকিত করে সে দৃশ্য সুন্দরতর। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবি যে নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন বাংলা কাব্যের জন্য তা নতুন।

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে 'ভাঙ্গামন্দির' বলে একটি কবিতা আছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীর্ণ দেবতালয়ে পূণ্যলোভীরা ভিড় করে না। পুষ্প প্রদীপে কেউ অর্ঘ দেয় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ভগ্নদেবালয় সুন্দর। কেননা, সেখানে পত্রপুষ্পের সম্ভার আছে এবং অজানা বনফুলের সুগন্ধ রয়েছে। মন্দিরের ভগ্নচত্বরে মাধবীলতা বেয়ে উঠেছে, এখানে যখন সূর্যের আলো নামে তখন মনে যেন নবীন প্রাণের হিল্লোল জেগেছে।[১৯] রবীন্দ্রনাথ অনেক কথায় এবং অনেক উপমায় যে সত্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই সত্যকেই মধুসূদন সংক্ষিপ্ততম বাণীবিন্যাসে অধিকতর প্রগাঢ়রূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দিবসের সূর্যের কথা বলেছেন যে, সূর্যের আলোকে জীর্ণ মন্দিরের পুষ্পসম্ভার আলোকিত হয়েছে, কিন্তু মধুসূদন বলেছেন রাত্রির নির্জনতার কথা, যখন জোনাকী অলৌকিক আলোর শিখা জ্বালিয়েছে চতুর্দিকে এবং চাঁদের কিরণ রূপমেখলা পরিয়েছে জীর্ণমন্দিরকে। মধুসূদনের বর্ণনায় জীর্ণমন্দির অলৌকিক শোভায় আমাদের দৃষ্টিকে অভিভূত করে।

'উদ্যানে পুষ্করিণী' কবিতাটিতে কবি মধুসূদন একটি সুশীতল নিভৃত বিশ্রামের চিত্র এঁকেছেন। পৃথিবী যখন তপনের প্রখর কিরণে দগ্ধিভূত হচ্ছে তখন উদ্যানের পুষ্করিণী শীতল এবং শান্ত। কেননা উদ্যানের বৃক্ষলতা পত্রময় শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পুষ্করিণীর শরীরকে শীতল করে। বাতাস যখন প্রবাহিত হয়, তখন পুষ্পের সুগন্ধ ষোড়শীর বক্ষদেশ স্পর্শ করে। মহিষীর শয়নকক্ষ যেরকম মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত পুষ্-

রিণীও তেমনি স্বর্ণশান্তি প্রস্ফুটিত পুষ্পের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। রাত্রি-কালে চাঁদ ষোড়শীর সঙ্গে বাসর যাপন করে, উদ্যানে পুষ্করিণীর এই বর্ণনায় আমরা বাংলাদেশের একটি মোহময় শান্ত পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হই! কবি ইয়েট্‌স্‌ যেমন নগরের জনাকীর্ণ পথে অবস্থানকালে অকস্মাৎ ইনিট্‌স্‌ক্রি হ্রদের কথা ভেবেছিলেন যেখানে বিশ্রাম আছে, শান্তি আছে এবং সজীবতাপূর্ণ উপঢৌকন আছে। কবি মধুসূদনও তেমনি ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের অপরিচিত জনতার মধ্য থেকে আপন মাতৃভূমির একটা সুনিবিড় আশ্রয়ের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত করেছেন।

মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এবং যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় সুদূর প্রবাসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেক কবিতায় তিনি হিন্দু ধর্মের অনেক অনুষ্ঠানকে মমতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এই কবিতাগুলো হচ্ছে, 'দেবদোল,' 'শ্রীপঞ্চমী' 'বিজয়াদশমী' ও 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। দূরদেশে থাকার ফলে দেশের সবকিছু তাঁর স্মৃতিতে মমতার সঙ্গে ভাস্বর হয়েছে! এই কবিতাগুলোতে কবিচিত্তের বেদনা মমতা এবং আকাঙ্ক্ষা এক প্রকার বাণীঅর্চনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অন্তঃসার হচ্ছে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি। আপন ভাষার প্রতি যে অর্ঘ্য কবি প্রদান করেছেন তা এক মহিমময় সুরের ঝংকারে আমাদেরকে আনন্দিত করবে। কবি বলেছেন, বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে বিবিধ রত্ন রয়েছে কিন্তু নির্বুদ্ধিতার কারণে এ সমস্ত রত্নকে অবহেলা করে অপরের ঐশ্বর্যলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিলেন এবং এ-অভিপ্রায়ে ভ্রমণ করেছেন বিদেশে এবং প্রার্থী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সর্বত্র। এভাবে জীবনে সুখ, শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছেন। অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে বহুরাত্রি, নিরাহারে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, অবরেণ্যকে বরণ করতে যেয়ে জীবন তাঁর অর্থহীন হয়েছে। পদ্মের উদ্যান ফেলে দিয়ে তিনি খেলা করেছেন শৈবাল-দামে। এ সময় স্বপ্নে কবির কুললক্ষ্মী কবিকে নির্দেশ দিলেন তুমি তোমার স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন কর, দেখবে তোমার মাতৃভাষায় যে সম্পদ রয়েছে তা তোমাকে ঐশ্বর্যবান করবে।

তার আজ্ঞা পালন করে কবি যখন তার মাতৃভাষাকে গ্রহণ করলেন তখন তিনি দেখলেন এ ভাষা অসংখ্য মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। এ কবিতায় কবির বক্তব্য খুব দীর্ঘ নয়। বিস্ময়কর পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন কবি তাঁর শব্দ ব্যবহারে। এ কবিতায় অপরিহার্য কতগুলো শব্দের যে দীপ্তিময় বিন্যাস ঘটেছে তাকে যথার্থ কাব্যস্বরূপের বাণীমূর্তি বলা যেতে পারে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের পরিণত মনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। চতুর্দশপদীর বন্ধনের মধ্যে ভাষাকে সংযতরূপে এবং শৃঙ্খলিত রূপবিন্যাসে তিনি উপস্থিত করেছেন। এইজন্য কাব্যগ্রন্থে কবি মধুসূদন অসাধারণ কুশলী শব্দশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় মধুসূদনের পরে অনেকেই সনেট লিখেছেন এবং আজও সনেট রচিত হচ্ছে, কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র দৃঢ় সংবদ্ধ অল্প-পরিধির বাণী ভঙ্গির মধ্যে মধুসূদন জীবনের প্রতি তাঁর যে আসক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা তুলনারহিত এবং বিস্ময়কর।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। এবং কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।[২০] ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধ রচনাকালে 'কবি মাতৃভাষা' নামে একটি সনেট রচনা করেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে এ-সনেটটি 'বঙ্গভাষা' কবিতায় রূপান্তরিত হয়। প্রথম রচনায় সনেটের একটি প্রথা প্রবর্তনই কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিলো। তার ফলে বক্তব্য প্রগাঢ় হয়নি। পরবর্তী রচনায় পংক্তির সীমাবন্ধন ও সনেটের প্রথাগত সিদ্ধির মধ্যে শব্দের চূড়ান্ত অভিব্যক্তিকে কবির আবিষ্কার করতে হয়েছে।

২

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলাভাষায় রচিত প্রথম সনেটগুচ্ছ। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে[২১] মধুসূদন বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন, "আমি আমাদের ভাষায় সনেটের প্রবর্তন করতে চাই এবং কিছুদিন পূর্বে এক সকালে নিম্নলিখিত সনেটটি রচনা করেছি—

কবি-মাতৃভাষা

'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি।
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি।
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে?"

কবিতাটি কেমন লাগল? আমার মতে "যদি প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এর চর্চায় রত হন, তাহলে একদিন আমাদের সনেট ইতালীয় সনেটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।"

অনেকদিন পর্যন্ত এ-সনেটটিই বাংলা ভাষায় সনেটের একক নিদর্শন ছিলো। ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁর প্রতিভাকে একাগ্র করেন সনেট রচনায়। সে সময়কার একটি পত্র এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য। পত্রটি গৌরদাস বসাককে লেখা—

"তোমার পত্রের শিরোনামে আবার বাগেরহাটের উল্লেখ দেখছি। আমার গ্রামের নদীর পারে এক বাগেরহাট আছে, একি সেই বাগেরহাট? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পাঠ করছিলাম এবং তাঁর রীতিতে কিছু সনেটও লিখেছি। একটি সনেট কপতাক্ষ নদীকে লক্ষ্য করে লেখা। আমি এটি এবং অন্য একটি সনেট তোমাকে পাঠাচ্ছি। শেষেরটি আমার কয়েকজন য়ুরোপীয় বন্ধুর বেশ ভালো লেগেছে। তাদেরে

আমি সনেটটি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস এটি তোমারও ভালো লাগবে। সনেটগুলো নকল করে যতীন্দ্র এবং রাজনারায়ণকে পাঠাবে, এবং তাঁরা এ-সম্পর্কে কি বলেন, আমাকে জানাবে। আমার বিশ্বাস সনেট বা চতুর্দশপদী আমাদের ভাষায় সুন্দর চলবে। এগুলোকে অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে।"[২২]

চিঠি দুটিতে স্পষ্ট হয় যে মধুসূদন ইতালীয় কবি পেত্রার্কার সনেটের রীতিতে বাংলাভাষায় সনেট রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইতালীতে পেত্রার্ক একটি বিশেষ স্বভাবের নাগরিক প্রেমের কলগুঞ্জনকে প্রকাশ করবার জন্য চোদ্দ পংক্তির কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাবগত এবং চরণান্তের মিলগত বিভাগ ছিলো।[২৩] প্রথম বিভাগটি আট পংক্তির এবং দ্বিতীয় বিভাগটি ছয় পংক্তির। প্রথম অংশকে অক্‌টেভ বা অষ্টক বলা হয় এবং দ্বিতীয় অংশকে সেস্‌টেট্‌ বা ষটক বলা হয়। প্রথম আট পংক্তিতে একটি বাণীমূর্তি নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় বিভাগের কিছুটা ভিন্নতর বাণীমূর্তি। চরণান্তের মিলের দিক থেকেও অষ্টকের মিল একরকম এবং ষটকের অন্যরকম। অষ্টকে দুটি কোয়াট্রেন বা চতুষ্ক থাকে যারা চরণান্তের মিলের বিন্যাসে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত। অষ্টকের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তি একে অন্যের সঙ্গে মিলযুক্ত, আবার দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তি একে অন্যের সঙ্গে মিলযুক্ত। ষটকের চরণান্তের মিল অষ্টকের মিলের মতো নিয়মবদ্ধ নয়। সেখানে কয়েক ধরনের মিলের উদাহরণ আমরা পাই। পেত্রার্কায় সনেটের মিলবন্ধন সাধারণত নিম্নরূপ :

ক খ খ ক   ক খ খ ক

দু-এক ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চতুর মিলবন্ধনও দেখা যায় :

ক খ ক খ   খ ক খ ক

ষটকে কয়েক ধরনের মিল দেখা যায়। যেমন—

গ গ ঘ   গ স ঘ
গ ঘ ঙ   গ ঘ ঙ
গ ঘ ঘ   ঘ গ গ

ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে সার টমাস ওয়াট ইংরেজী কাব্যে পেত্রার্কীয় সনেটের প্রবর্তন করেন।[২৪] ওয়াট পেত্রার্কের অষ্টকের অন্ত্যানুপ্রাস ঠিক রেখেছিলেন কিন্তু ষটকের ক্ষেত্রে একটি চতুষ্ক এবং সর্বশেষে একটি চরণদ্বৈত নির্মাণ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর অন্ত্যানুপ্রাস পদ্ধতি ছিলো নিম্নরূপ :

গ ঘ ঘ গ ঙ ঙ

ওয়াটের সহযোগী এবং বন্ধু আর্ল অব সারে ইংরেজী ভাষার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অষ্টক ষটকের পরিবর্তে তিনটি চতুষ্ক এবং একটি চরণদ্বৈতের মাধ্যমে সনেটকে উপস্থিত করলেন। তাঁর সনেটের একটি প্রসিদ্ধ মিলবন্ধন নিম্নরূপ :

ক খ খ ক গ ঘ ঘ গ ঙ চ চ ঙ ছ ছ

শেকস্‌পীয়রের সনেটের গঠন সৌষ্টবেও আমরা তিনটি চতুষ্কে এবং একটি চরণদ্বৈতকে পাই, যেমন—

ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ চ ঙ চ ছ ছ

মিলটনের হাতে সনেটকে আবার নতুন করে প্রেত্রার্কার পদ্ধতিতে নির্মিত হতে দেখি।[২৫] মিলটনের ইংরেজী সনেটের সংখ্যা আঠারো। সবগুলোর অষ্টক পেত্রার্কার পদ্ধতিতে সজ্জিত—ক খ খ ক ক খ খ ক। কিন্তু সবগুলোর ষষ্টক একরকম নয়। ষটকগুলো নিম্নরূপ—

১. সাতটি সনেটের ষটক : গ ঘ গ ঘ গ ঘ।
২. পাঁচটি সনেটের ষটক : গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ।
৩. দুটি সনেটের ষটক : গ ঘ ঙ ঘ গ ঙ।
৪. দুটি সনেটের ষটক : গ ঘ ঘ গ ঘ ঙ।
৫. একটি সনেটের ষটক : গ ঘ ঘ গ ঙ ঙ।
৬. একটি সনেটের ষটক : গ ঘ গ ঙ ঙ গ।

মধুসূদনের সনেটগুলো পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হবে যে তিনি পেত্রার্কার ধরনের সনেট নির্মাণ করবেন বলেছিলেন বটে কিন্তু মূলতঃ পেত্রার্কাকে তিনি অনুসরণ করেননি তাঁর আদর্শস্থল ছিলো মিলটন। মধুসূদনের চতুর্থ সনেট এবং মিলটনের ৯, ১০, ১৭, ১৯ এবং ২১ সংখ্যক সনেট

একই ধরণের অষ্টক ও ষষ্টকের বিভাগসহ পদান্তগত মিলে একে অন্যের সঙ্গে সমান্তরাল! অবশ্য মিলটনের আদর্শও ছিলো পেত্রার্ক। তবুও মধুসূদন মিলটনকে অনুসরণ করেছিলেন একারণে বলেছি যে প্রথমতঃ মধুসূদনের অধিকাংশ সনেটের ষটকের মিলবন্ধন মিলটনের অনেকগুলো ষটকের মিলবন্ধনের মতো— গ ঘ গ ঘ গ ঘ। এ-ধরনের ষটক মধুসূদনের আটত্রিশটি সনেট আছে এবং মিলটনের সাতটি সনেট। তা'ছাড়া মধুসূদনের ৩ সংখ্যক সনেটের (বঙ্গভাষা) ষটক, মিলটনের ১৫ সংখ্যক সনেটের ষটকের অনুরূপ যেখানে একটি চতুষ্কের শেষে একটি চরণদ্বৈতে ষটকটি নির্মিত হয়েছে—গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ। মধুসূদনের ৭-সংখ্যক সনেটের কৃত্তিবাস ঘটক তাঁর ৪-সংখ্যক সনেটের ষষ্টকের অনুরূপ, যদিও অষ্টকে এদের মধ্যে মিল নেই। মিলটনের দুটি সনেটের ষটক—গ ঘ ঘ গ ঘ গ। মধুসূদনের ১০ সংখ্যক সনেটের (মেঘদূত) ষষ্টকের সঙ্গে মেলে। এভাবে অগ্রসর হয়ে আরও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়, পেত্রার্কার সনেটে ধ্বনি, চরণান্তের মিলবিন্যাস এবং আবহে অষ্টকের একটি সম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু মধুসূদনের সনেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অষ্টক ও ষটক ভাষা ও ব্যাকরণের দিক থেকে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতার কারণে অনেক সময় অষ্টকের শেষ পংক্তি ষটকের প্রথম পংক্তির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। মিলটনের সনেটে অবিকল একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়, পেত্রার্কীয় সনেটের বিষয় কোর্টলি লাভ বা নাগরিক প্রেম, কিন্তু মধুসূদনের সনেট কখনও ব্যক্তি-প্রশস্তি কখনও বস্তু প্রশস্তি এবং কখনও নিবেদন। মিলটনের সনেটও ব্যক্তি বা বস্তু-প্রশস্তি এবং নিবেদন।

এভাবে পরীক্ষা করলে মিলটনের উপরই মধুসূদনের বিশেষ নির্ভরতা লক্ষ্য করা যাবে।

টীকা

১. ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই (Versailles) নগরীতে অবস্থানকালে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। একটি বিদেশী পরিবেশে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে প্রধানতঃ স্বদেশগত যে স্মৃতির উজ্জীবন ঘটে এ-কবিতাগুলো তারই রূপাভিব্যক্তি।

২. ইংরেজীতে একটি কথা আছে, crystal moment অর্থাৎ এমন একটি মহূর্ত যখন জীবনের একটি স্মৃতি উল্লেখযোগ্যতা পায় এবং স্বচ্ছ ও প্রদীপ্ত হয়ে চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। আমি একেই প্রদীপ্ত মুহূর্ত বলেছি।

৩. যে-সমস্ত কাব্যপাঠগত অধীত বিদ্যার কথা আমি বলছি, তা, হচ্ছে 'মহাভারত', রামায়ণ', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'আনন্দমঙ্গল', শিশুপালবধ কাব্য', 'কিরাতার্জুনীয়', 'নাট্যকাব্য', বিক্রমোর্বশী, মেঘদূত ও শকুন্তলা।

৪. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৪ সংখ্যক কবিতা।

৫. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ১৫-সংখ্যক কবিতা। কবিতার শিরোদেশে 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে উদ্ধৃতি আছে—'শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।'

৬. আমি আমার আলোচনায় সর্বত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারতকে অনুসরণ করেছি। আমার অবলম্বন ছিলো বসুমতী কার্যালয় থেকে বংলা ১৩১৬ সালে প্রকাশিত সংস্করণ।

৭. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৬-সংখ্যক কবিতা।

৮. 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী'তে 'বীর-রস' নামে অন্য একটি কবিতা আছে (৫৩ সংখ্যক)। কবিতাটিতে 'বীর-রসের' প্রতি কবির প্রবণতা স্পষ্ট হয়।

৯. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৫৫-সংখ্যক কবিতা।

১০. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৫১-সংখ্যক কবিতা।

১১. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৭২-সংখ্যক কবিতা।

১২. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৮১-সংখ্যক কবিতা।

১৩. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৭-সংখ্যক কবিতা। উল্লেখ্য অংশটি নিম্নরূপ :

'পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা কথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;
তেমনি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !'

১৪. 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ।

১৫. 'সংস্কৃত কাব্যধারা' : রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কিতাব মহল, ইলাহাবাদ ১৯১৮।

১৬. ঐ।

১৭. ঐ।

১৮. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৩৪-সংখ্যক কবিতা।

১৯. 'রবীন্দ্রনাথ : কাব্য-বিচারের ভূমিকা'. সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৫১, পৃষ্ঠা : ৭০।

২০. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার সম্পূর্ণ ইতিহাস উক্ত কাব্যগ্রন্থের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

২১. "I want to introduce the sonnet into our language and some morning ago, made the following·········
What say you to this my good friend ; In my humble opinion if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

২২. "You again date your letter from 'Bagirhat'. Is this Bagirhat on the bank of my own native river, I have been lately reading petrarca—the Italian poet, and suribbling some 'sonnets' after his manner. There is one addressed to this river 'কবতক্ষ'। I send you this and another the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet 'চতুদ্দ'শপদী' will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

২৩. Enid Homer রচিত 'The Metres of English Poetry' (Methuen & Co. Ltd. London, 1930) নামক গ্রন্থের The Sonnet অধ্যায়ে পেত্রার্কীয় সনেট এবং সে-রীতিতে নির্মিত ইংরেজী সনেট সম্পর্কে আলোচনা আছে।

২৪. Wyatt এবং Surrey-এর সনেটের সংগ্রহ Songes and Sonettes' নামে লণ্ডন থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক Tottel-এর নামে সংগ্রহটি Tottel's Miscellany নামে বিখ্যাত।

২৫. Poetical Works. John Milton, Oxford at the Clarendon Press সংস্করণ দ্রষ্টব্য। মিলটনের সনেটের বিষয়বস্তু প্রেম ছিল না। একটি মাত্র সনেটে তাঁর মৃত স্ত্রীর বিষয়ে একটি স্বপ্নের উল্লেখ আছে। তাঁর কোনো সনেটে বন্ধুদের স্তবনামা, কোনো সনেটে জাতীয় বীরের প্রশংসা এবং কোনো কোনো সনেটে বলিষ্ঠ কোনো বিশ্বাসের আত্মপ্রকাশ আছে! ইতালীয়দের এবং কাব্যরীতির উপর তাঁর প্রচণ্ড অধিকার ছিলো।